



ও রিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, আমাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
আখিন, ১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীধনজ্বর প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫-এ, মুদিরাম বহু রোড
কলিকাতা ৬

রূপসজ্জা
শিল্পী ধীরেন বল

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
মোহন প্রেস
২ করিসচার্ট লেন
কলিকাতা ৯

বঁাধাই
মডার্ন বাইওস

দাম : দুই টাকা চার আনা

পরশুরাম

শ্রীকরকমলেশু

ছেলেবেলা শুধু ছেঁড়া-ভাব আর খোঁড়া-ছন্দেই টানি-
মিল খুঁজে-খুঁজে কবিতা রচিতে হইয়াছি হয়রাণি !
মানুষের মাঝে কত কৌতুক—তুমি যে ক্যামেরা ধরি,
দেখালে রঙীন চশমা লাগায়ে, তাইত তোমারে স্মরি !
একলব্য যে গুরু-দ্রোণে দিল কাটি বৃদ্ধাদুলি—
‘পরশুরামের’ চরণে রাখি নু মন-গড়া ভুলগুলি !

আশ্বিন,

১৩৬০ ।

বিনীত

স্বপনবুড়ো

মুখবন্ধ

‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গ ভরা’

সত্যি তাই। বঙ্গদেশ ভঙ্গ হয়েছে বটে, তবু তার রঙ্গ এতটুকু
কমেনি! বরং আরও বেড়েছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তও একথা হয়ত জানতেন না। বেঁচে থাকলে
অনেক কিছু নতুন করে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাই কৌতুক
করে বলেছিলেন—

“আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে

কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদ গন্ধ আমি ত পাই মুহূন্দ

আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।”

*

*

*

এই হাসিব গল্পগুলি পাড়ে পাঠক-পাঠিকারা হাসবেন কিনা
জানিনা, তবে একটি কথা আগে থেকেই স্বীকার করে রাখা ভালো
যে, গল্পগুলি বয়স্কদের জন্যেই রচিত হয়েছে, ছোটদের জন্যে নয়।

আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক যে
আন্তরিকতা নিয়ে তাড়াতাড়ি বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করে
দিয়েছেন তা চিরদিন আমার মনে অঙ্কয় হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে
এক মাসের মধ্যেই পুস্তকখানি মুদ্রণ-যন্ত্র থেকে মুক্তিলাভ করেছে।
আজকের ডামাডোলের যুগে তাকে প্রায় রেকর্ড করা বলা
যেতে পারে।

এই অবকাশে শিল্পী ধীরেন বলকেও আমার প্রীতি জানাই।

কলিকাতা

স্বপনবুড়া

আশ্বিন, ১৩৬০।

বুঙ্গ-তালিকা

সাহিত্য-সভা	১
হিট্-পিক্চার	২১
পঞ্চশরের পরাজয়	৩৬
হুস্ব-দীর্ঘ	৫৫
শারদীয় রস-স্মৃতি	৬১
খুনী	৭৩
হুর্ভাবনা	৮১
অবশেষে	৯৪
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	১০৪
প্রতিক্রিয়া	১১০
চীনে বাদাম	১২২
হি'হু-মুসলিম প্যাঙ্ক্	১৪১
ঢাকের বাড়ি	১৫১
টোটকা	১৬০
নবোদিত সিনেমা তাড়কার একদিন	১৭৩
ড্রপ ওঠার আগে	১৮২



ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী !

—নামটা ইতিমধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন—এবং পাঠক-পাঠিকাদের ভেতর অনেকেই এই বিশেষ নামটি জপমালা করে ফেলেছেন।

আর না হবেই বা কেন ?

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী বাঙলা দেশের নারী-পুরুষের মন নিয়ে যেন একেবারে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দিয়েছেন !

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন চমকপ্রদ নাম আর কোনো সাহিত্যিক করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কী চোখা-ভাষা আর রোখা-বুলি !

‘কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিয়ে দেয়’ বললে ভুল করা হবে..., বাস্তবকে অনুসরণ করে উক্তি করা চলে যে, চমের ভেতর দিয়ে যেন সূচিকাভরণ করে দেয়।

এ হেন ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর সভা-সমিতি থেকে ঘন-ঘন ডাক আসে। ইনি না গেলে কোনো সাহিত্য-সভাই নাকি জমে না ! ত্রিপাঠীর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ গম্-গম্ করতে থাকে, তাঁর শ্লেষ আর বিদ্রোপে সবাই ভয়ে তটস্থ ; তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত তীক্ষ্ণ বাক্যরাশি শাণিত তরবারির মতো মানুষের পুরাতন সংস্কার, জীর্ণ-মত, আর বস্তু-পচা বুলিকে খণ্ড খণ্ড করে এগিয়ে চলে। শ্রোতা অবাক হয়ে ভাবে—উঃ ! মানুষটার কি অগাধ পাণ্ডিত্য ! চলতি মত আর পথকে তুলোধূনো করে নিজের মন মতো বিরাট সড়ক মুহূর্তে তৈরী করে দিয়ে চলে চান। তিনি প্রশ্নান করলে তবে অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মুস্কিল এই যে, তাঁকে যেমন সবাই যনের মতো ভয় করেন—তেমনি তাঁকে বাদ দিলে কোনো সাহিত্য-সভাই জমে না। শিবহীন যজ্ঞের মতো তা শেষ পর্যন্ত ‘দক্ষযজ্ঞে’ পরিণত হয় !

তাঁই ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একাধারে ভয় ও বিশ্বয় উৎপাদন করে সভাপতিত্ব করে ফেরেন—শহরে, শহরতলীতে, মহকুমায়, গ্রামে আর মহানগরীতে !

খুব বেশী লক্ষা আর পেঁয়াজ বাটা মেশানো তরকারী যেমন

লোকে চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খায় এবং তারপর নাকের জলে, চোখের-জলে এক হয়ে ওঠে তেমনি 'ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীকে মানুষ ডেকে নিয়ে যায় বিভিন্ন অঞ্চলে, কিন্তু তারপরই তাঁর বাক্য-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মনে-মনে বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি !

তবু জনসাধারণের মনে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা লুকিয়ে থাকে—তারই ফলে যে মানুষটি জ্বালা দিয়ে কথা বলে, বিদ্রূপ করে, সমস্ত কিছু আয়োজনের একটা অকিঞ্চিৎকর অর্থ বের করে উৎসবকে পণ্ড করতে চায় তাকেই লোকে ঝাল তরকারির মতো বেশী করে চায় জীবের স্বাদের জন্যে ! চোখের জল পড়ুক তাতে আপত্তি নেই, তবু জীবের ত' সোয়াদ হল ।

তাঁই ত' সভা-সমিতি, সংস্কৃতি-কেন্দ্র, বারোয়ারী-তলার লোকেরা ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীকে সম্মানে ডেকে নিয়ে যায়, মালা দেয় গলায়, অসীম-পুলকে তীব্র বাক্যবানে বিদ্ধ হয়, তারপর নিজেদের খরচায় গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায় !

অনুষ্ঠান অন্তে সাত দিন ধরে সেই অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি কবে, হ্যাঁ লোকটা শোনাতে বটে ! মরা-মানুষের চামড়াতেও জ্বালা ধরিয়ে দেয় !

বিহ্বালের মধ্যে বজ্র আছে বলেই বৃষ্টি লোকে তাকে এত বেশী ভয় করে । ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সভায় গিয়ে যত কড়া কথা শোনান তাঁর জনপ্রিয়তা তত বেশী বৃদ্ধি পায়—এটা নিছক অনুমান নয়, চোখে দেখা কথা ।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর উপন্যাসগুলিও স্ত্রী-পুরুষের মনে স্নায়ু-যুদ্ধ শুরু করিয়ে দেয় ।

নানা বিচিত্র চরিত্র সেই উপন্যাসে ভীড় জমায়। প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার মনে কোন একটি চরিত্র তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে, এই মানুষটি হচ্ছে তুমি! তোমাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তারপর আঘাতে আঘাতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে—খুলির সঙ্গে!

নিজের দেহ যতই কুংসিং হোক—তাকে নানাভাবে আয়নাঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার যেমন একটা প্রলোভন মানুষের থাকে তেমনি ত্রৈলোকা ত্রিপাঠীর শাপিত লেখনীতে সে নিজে কিভাবে রূপলাভ করেছে সেটা দেখবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাঠক-পাঠিকা মহলে গোপনে বাসা বেঁধেছে। যতই তারা মনে-মনে আহত হোক, ত্রিপাঠীর উপন্যাস না পড়ে তাদের গতাত্তর নেই। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পড়ে লুকিয়ে, শিক্ষক পড়েন ছাত্রদের আড়াল করে টিফিনের ঘণ্টায়, মহিলারা পাঠ করেন ছুপ্রহরের সুখ-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে—আর অফিসের বাবুরা পড়েন—ডেস্কের ভেতর লেজার খাতায় লুকিয়ে।

এমন কাহিনীও ইদানিং শোনা গেছে যে, স্ত্রী পড়েন স্বামীকে লুকিয়ে এবং স্বামী পাঠ করেন স্ত্রীকে আড়াল করে। এইভাবে ত্রিপাঠীর উপন্যাস কত সুখের দাম্পত্য-জীবনকে যে তচ্‌নচ্ করে দিয়েছে—পশ্চিম বাঙলা সরকার হিসেব রাখলে দেখতে পারতেন যে, তার সংখ্যা নগণ্য ত' নয়ই বরং ক্রমবর্ধমান!

ত্রিপাঠীর উপন্যাস প্রকাশের জন্য প্রকাশক মহলে একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রকাশকই 'রয়ালটি'র মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর প্রলোভন দেখাচ্ছেন, আমাদের

ছাড়া আর কাউকে দেবেন স্মার ! এমন ‘গেট-আপ্’ করে উপন্যাস ছাপাবো যে, লোকের দেখে তাক্ লেগে যাবে !

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী মনে-মনে মুচ্কি হাসেন আর কলমের ডগায় আরো বেশী ধানী লক্ষার গুড়ো মেশান ।

ত্রৈলোক্য তাঁর নিজের অঞ্চলে শনি-ঠাকুরের মতো একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছেন । প্রতিবেশিনী, প্রতিবেশীরা ভাবেন— তাঁদের সবাইকে অপরূপ রূপসজ্জায় সাজিয়ে তিনি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করেন ! কাজেই কেউ তাঁর সঙ্গে মন-খুলে কথা কইতে রাজি নন্ । অথচ তাঁদের পাড়ায় ত্রৈলোক্য বাস করেন এটাও সকলের পরম গর্বের বিষয় ।

এই বিপনীতমুখী মনোভাব নিয়ে ত্রৈলোক্যের প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীর দল সর্বদাই হাসি আর অশ্রু-সায়রে দোলায়মান !

ত্রিপাঠী ঠিক করে নিয়েছেন—ভালো হোক—মন্দ হোক, মাঝারি হোক—প্রত্যহ তিন ফমা পরিমাণ লেখা তাঁকে প্রসব করতেই হবে । নইলে প্রকাশক মহলের চাহিদা মেটানো শক্ত ! ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা যেমন রচনায় হাত মগ্ন করে, ত্রিপাঠী তেমনি সকাল-সন্ধ্যায় খাতা পেন্সিলের সঙ্গে সময় সুখ করে দেন । যতবেশী লেখেন তারও অধিক লেখনী-আন্দোলন করেন । লিখতে লিখতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুইট হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মহাশূন্তে কার বিরুদ্ধে আত্মালাপ জানান !

ত্রিপাঠীর বাড়ীর আশে-পাশে যারা থাকেন তাঁরা এই সময়টায় কামেরা নিয়ে অপেক্ষা করেন—লেখকের ভাবাবেগের ছবি ‘স্ন্যাপ্, সটে’ তুলে নেবার জন্যে ; এগুলি দেশের সাপ্তাহিক ও সিনেমার

কাগজগুলি টিকা-টিপ্পনী সমেত প্রকাশ করে। তার ফলে আলোক-চিত্র গ্রহণকারীর বেশ কিছু লাভ হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একটি নতুন ধরণের মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসে সবে হাত দিয়েছেন এমন সময় বাইরের ঘরের কড়া ঘন ঘন শব্দিত হয়ে উঠল।

বাড়ীতে তখন কেউ নেই, চাকরটাকে পাঠানো হয়েছে সিগারেট কেনবার জন্তে। ঘন ঘন ধোঁয়া না ছাড়লে ত্রিপাঠীর লেখা নাকি ভালো জমে না। কাজেই তাঁর টেবিলের ওপর থরে-থরে সাজানো থাকে নানা স্বাদের ও বিচিত্র গন্ধের সিগার-সিগারেট। যখন ভাবাবেগ সপ্তমে গিয়ে পৌঁছয় ত্রিপাঠী চক্ষু মুদ্রিত করে তখন কেবল বিড়ি টানতে থাকেন।

নাঃ! কড়া নাড়ার শব্দটা ক্রমশঃ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। ত্রৈলোক্য চটি পায় দিয়ে দোতলা থেকে ফট্‌ফট্‌ করতে করতে নেমে এলেন একতলায় বসবার ঘরে। ছড়কো খুলে দিতেই পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি ভদ্রলোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ত্রৈলোক্য প্রথমটা হচ্‌চকিয়ে গেলেন। চোর-ছ্যাঁচড় নয় ত! আজকাল কলকাতা সহরের যা কাণ্ড-কারখানা হয়ে উঠছে—কাউকেই বিশ্বাস নেই।

মুখ দেখেই লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করতে পারেন বলে ত্রিপাঠীর একটা প্রকাণ্ড দাস্তিকতা আছে। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই সবাইকার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিলেন।

নাঃ! মারাত্মক ভেমন কিছু নয়।

সকলকার মুখে-চোখেই একটা ‘বশম্বদ’ বিনীতভাবে যেন লেগে রয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে তিনি সবাইকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি তাঁদের প্রয়োজন।

পল্লীবাসীদের মধ্যে একজন সহরাঞ্চলে থেকে চাকরী-বাকরী করেন এবং কলকাতার একটি মেসে অবস্থান করেন। তিনিই মুখপাত্র হিসেবে কথা শুরু করলেন : আজ্ঞে, আমরা বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি—

ত্রৈলোক্য মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, আমিই ত্রিপাঠী, আপনাদের কি দরকার আমাকে বলতে পারেন।

সবাই সবিনয়ে ত্রিপাঠীকে নমস্কার জানালেন। মুখপাত্র বললেন, দেখুন, আমরা গ্রানাকলের লোক। সেখানকার লোকে শুধু আপনার নামই জানে কিন্তু সাম্না-সাম্নি দেখে জীবন সার্থক করতে পারে না ! তাই আমরা এক বিরাট সাহিত্য-সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে গিয়ে পৌরোহিত্য করতে হবে।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর হঠাৎ কি মনে হতে জবাব দিলেন, দেখুন, সহর অঞ্চলেই আমাকে বেশী সভাপতিত্ব করতে হয়। পল্লীর লোক যে আমার বই পড়ে সেটা জানা ছিল না। শুনে আনন্দিত হলাম।

ভদ্রলোক বিনয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে কইলেন, আজ্ঞে আপনি বলছেন কি ! আপনার লেখা বই পল্লী অঞ্চলের লোকেরা পড়ে না এ আপনি মনেও স্থান দেবেন না ! লোকে রামায়ণ-মহাভাবত ফেলে ছুঁবেলা আপনার বই কণ্ঠস্থ করছে ! আমাদের লাইব্রেরীতে প্রতি মাসে আপনার বই কেনা হয়।

এই মুখরোচক বার্তা শুনে ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সত্যি পুলকিত হয়ে উঠলেন, বল্লেন, সত্যি, সহরে বাস করে গ্রামকে আমি প্রায় ভুলতেই বসেছি। পল্লী অঞ্চলে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে করে বৈ কি !

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আজ্ঞে, আমাদের গাঁয়ে আপনার মতো লোকের পায়ের দ্বারা পড়লে সত্যি আমরা ধন্য হয়ে যাবো। এই সাহিত্য-সভায় আপনাকে অবিশিষ্ট করে যেতে হবে।

কলকাতার রেশনের চাল আর আটা খেয়ে ত্রিপাঠীর মন-মেজাজ বিষিয়ে উঠেছিল। মনে-মনে ভাবলেন, গ্রাম দেশে গিয়ে যদি অস্তুত দু' দিনও খাঁটি জিনিষ খেতে পান তবে দাঁত আর পেট নিশ্চয়ই বেশ আরাম বোধ করবে। তাই রসিকতা করে শুধোলেন, আপনাদের গাঁয়ে খাঁটি দুধ-ঘি মিলবে ত ?

মুখপাত্র এইবার উৎসাহে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। জিবে যতদূর সম্ভব জল এনে, গলাটি মোলায়েম করে জবাব দিলেন, আজ্ঞে, সে কথা আর আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না। আপনার সেবার ভার নেবার জন্তে গাঁয়ের লোক উৎসুক হয়ে আছে। ক্ষেতের ধানের সরু চাল, পুকুরের মাছ, বাগানের টাটকা তাজা শাক সব্জী—সহরের লোক আপনারা যাকে 'ভিটামিন' বলেন; এছাড়া কচি নধর পাঁটা, বাড়ীর বো-ঝাদের তৈরী খাঁটি গাওয়া ঘী, গোয়ালের গাইয়ের ঘন দুধের পায়েরস, ছানা—যা আপনি ভকুম করবেন—

দীর্ঘ তালিকা শুনতে শুনতে ত্রিপাঠীর রসনাও লাল-সিক্ত হয়ে উঠেছিল। বল্লেন, বাস্! বাস্! যা' ফিরিস্তি আপনি দিলেন—তাতে সভাপতির ভাষণটা বিশেষ মুখরোচক হবে বলেই মনে হচ্ছে—

সম্মতি লাভ করে পল্লী অঞ্চলের লোকেরা খুশী মনে মুখপাত্রের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

সেদিন রাত্রে ত্রৈলোকা ত্রিপাঠীর নতুন উপস্থাসের প্রথম পরিচ্ছেদ আর ভালো করে জমে উঠতে পাবল না। তাঁর মনে রসালো খাণ্ডগুলি কেবলি আনাগোনা করতে লাগলো, এবং তিনি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিব নেড়ে, মুখ চট্কে থেকে থেকে তাদেরই ধ্যান করতে লাগলেন।

যথাসময়ে সাহিত্য-সভার নির্ধারিত দিন এসে উপস্থিত হল।

দুপুরবেলা ঠেসই মুখপাত্র ভদ্রলোকটি ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন।

আজ ত্রৈলোকা ত্রিপাঠী একটু বিশেষভাবে সাজ-সজ্জা করেছেন। সাহিত্য-সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শরীরকে একটু আয়েস দিতে হয়। অনেকদিন বাদে বাঙলার পল্লী অঞ্চলে যাচ্ছেন, অনেক কিছু মনের খোরাক পাবেন, বহু বিচিত্র ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা হবে, তাতে প্রচুর রসদ তিনি পাবেন সাহিত্য সৃষ্টির অম্লকূলে! আদ্রির গিলে করা পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি, পাম্প সু...সেটা এত বেশী চক্চকে করা হয়েছে যে নীচু হ'লে দিবা আয়নার কাজ করে—মানে মুখ দেখা যায়। ফিনফিনে উড়নী জড়িয়ে নিয়েছেন আদ্রির পাঞ্জাবীর ওপর। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে বেশ বোঝা যাবে যে, তিনি 'সেন্ট' মাথতেও ভুল করেন নি।

ত্রিপাঠী-গৃহিণী রসিকতা করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ফোঁড়ন দিলেন, এই বয়সে যে ভাবে নব-কার্তিকটি সেজে যাচ্ছে—দেখো, আবার ভুল করে আমার জন্মে একটি সতীন যোগাড় করে এনো না!

ত্রিপাঠীও কৌতুক কঠে জবাব দিলেন, সহরের মেয়ের সঙ্গে ত অনেকদিন প্রেমালাপ করা গেল, এখন পল্লী বালার পাণিগীড়ন করলে দোষ কি ? নতুন প্রেরণা হয়ত সেই অনাত্মাত পুষ্পই দিতে পারবে।

ত্রিপাঠী গৃহিণীও ছাড়বার পাত্র নন। বলেন, সেই পল্লী-বালারূপ পুষ্পে কীটও ত' থাকতে পারে! খুব বুঝে-শুনে আত্মাণেব চেষ্টা কোরো।

রস আর কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ত্রৈলোকা ত্রিপাঠী 'সভাপতির অভিভাষণ' পাকেটে নিয়ে মুখপাত্রের সঙ্গে টাক্সিতে উঠলেন।

এমন অভিভাষণ তিনি রচনা করেছেন—যা শুনে পল্লী অধিবাসীরা স্তব্ধ হয়ে থাকবে—মানে তাঁকে আরো বেশী ভয়-ভক্তি করতে শিখবে।

ত্রৈলোকা জিজ্ঞাস করলেন, কোন মেইলে আমরা যাবো ? মুখপাত্র সবিনয়ে জবাব দিলেন, আজ্ঞে মেইল কোথা পাবো আমরা ? 'মার্টিন' লাইনেই আমাদের যাতায়াত। আমরা পাড়ারগায়ের লোক হতে পারি কিন্তু আদর আপায়নে আমাদের কিছুমাত্র ত্রুটি ধবতে পারবেন না। মার্টিন লাইনের কথা শুনে ত্রৈলোকা ত্রিপাঠীর মনটা একটু দমে গেলেও দুঃখী, মাছ-মাংসের আশায় বেশ খানিকটা চাঙা হবার চেষ্টা করলেন।

প্রথম শ্রেণী হলে কি হবে ? একেবারে ছারপোকাকার ডিপো। আর এমন একটা বদ্ শূটকি মাছের গন্ধ গাড়ীর ভেতর থেকে বেরুচ্ছে যে, অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত উঠে আসবার উপক্রম হল !

কিন্তু তিনি সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন—বিচলিত

তাকে হলে চলবে না ! বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলাই ত' সত্যিকারের জীবন ! তবু মনটা থেকে থেকে খুঁত-খুঁত করে উঠল যে, আদির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুৰী ধুতি না পরে এলেই হত !

ষ্টেশনের পব ষ্টেশন চলে যাচ্ছে—অদ্ভুত তাদের নাম । কিন্তু সেদিকে তাঁর আক্ৰেপ নেই । বহুকাল পরে তিনি পল্লী-অঞ্চলে যাচ্ছেন—, কী ভাবে সেখানকার লোকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে, কে তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে, কোন ধনবান গৃহস্থের গৃহে তাঁকে সবাই তুলবে—চোখ বন্ধ করে তিনি সেই সবই আপন মনে ছবি এঁকে যাচ্ছিলেন । এইভাবে কত সময় যে কেটে গেছে সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও হুঁস ছিল না ।

হঠাৎ মুখপাত্রের বিনীত আহ্বানে তার চমক ভেঙে গেল, তিনি আত্মস্থ হয়ে চোখ মেলে উঠে বসলেন ।

—আজ্ঞে, এইবার আসছে আমাদের ষ্টেশন—আপনি তৈরী হয়ে নি—মুখ বাদান হবে মুখপাত্র জানানলেন ।

—ষ্টেশনটার নাম কি ? আলস্যভরে জিজ্ঞেস করলেন ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী ।

—আজ্ঞে 'নাকে-দড়ি'—ঠিক আগেরই মতো একান্ত অনুগত বশস্থদের ঞায় উত্তর দিলেন মুখপাত্র ।

এইবার চম্কে উঠলেন—ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী ।

চোখ দুটো বড় বড় করে শুধোলেন, নাকে-দড়ি ? কৈ সে কথা ত' আপনি আমাকে আগে জানান নি !

অধিকতর বিনয়ের ভান করে মাথাটা নুইয়ে মুখপাত্র জবাব

দিলেন, আজ্ঞে, আপনি ত' আমাদের গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করেন নি !

—তা বটে ! ত্রিপাঠি ভাবিত হয়ে পড়লেন । অত্যধিক ধূম উদগীরণ করে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গাড়ী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে নাকে-দড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত হল ।

হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখা একদল ছেলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছিল “ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী কী জয় ।”

ত্রিপাঠী শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপাব কি আপনাদের ?.. হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে এরা সাহিত্য-সভা করবে নাকি ?

মুখপাত্র মুখে স্মিত হাসি টেনে জবাব দিলেন, আজ্ঞে সাহিত্য-সভা ত' নয়, ফুটবল খেলা ! আর খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কি না—পাড়া গাঁয়ের রাস্তা—বুঝতেই পারছেন !

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন !—সাহিত্য-সভা নয়, ফুটবল খেলা । তা আমি কি করবো ! আমায় কেন মিছিমিছি টেনে নিয়ে এলেন এখানে ?

—আজ্ঞে আপনাকেই ত' রেফারিগিরি করতে হবে ! নামকরা লোক না হলে ছেলেদের মন ওঠে না ! অথচ এই পাড়া গাঁয়ে কেউ আস্তে রাজি হয় না । তাই বাধ্য হয়ে সাহিত্য-সভার নাম করে আপনাকে নিয়ে এসেছি । আমার অপরাধ নেবেন না স্যার ! কল্কাতায় থেকে চাকরি করি বলে গাঁয়ের ছেলেবা সবাই আমাকেই মুখপাত্র ঠিক করেছে । তাই নিজের একটা বুদ্ধির ক্যারামতি দেখিয়ে দিলাম !

হি-হি শব্দে মুখপাত্র তাঁর সামনে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত করে হাসতে লাগলেন।

ত্রিপাঠীর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল। তিনি দেশের মানুষকে শ্লেষ-বিক্রপ করে কোন্ঠাসা করে রাখেন আর সামান্য অজ-পাড়াগাঁয়ের এক বিকৃত-বদন-ব্যক্তি তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে !

চোখ পাকিয়ে ত্রিপাঠী হুংকার দিয়ে বলেন, আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না !

বিনীত ভাবে হাত কচলে মুখপাত্র বলেন, দেখুন, ত্রিপাঠী মশাই, এখন আমাদের রাজ্যে এসে পড়েছেন—বেশী ট্যাংকো করলে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো, কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না। তাই বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে যা বলছি শাস্ত-শিষ্ঠ সুবোধ ছেলের মতো করে যান। প্রাণে বাঁচবেন, আর আপনার সম্মানও বজায় থাকবে।

ত্রৈলোকা ত্রিপাঠী চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দূরে শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে প্লাটফর্ম থেকে ছেলের দল চীৎকার করে উঠল, নেমে আসুন ত্রিপাঠী মশাই, আমরা আপনাকে কাঁধে করে মাঠে নিয়ে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে ছুটে এসে তাঁর গলায় একটি জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। মনে হল, আদ্রির পাঞ্জাবীতে জবা ফুলের দাগ লেগে তার শুভ্রত্ব কলঙ্কের কালিমা এঁকে দিলে !

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী নিজেকে অত্যন্ত বিড়ম্বিত বলে মনে করলেন।
কথায়—বলে “পড়েছ যবনের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।”

আপত্তি করে কোনো লাভ নেই—তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে
ছেলেদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

তারা নীচে দল বেঁধে এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল।
দু’জন জাঁদরেল ছেলে এক ঝাঁকুনীতে তাঁকে কাঁধের ওপর



তুলে নিলে। সঙ্গে
সঙ্গে অন্য সবাই
আকাশ ফাটা চীৎকার
করে উঠল—
“ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী
জিন্দাবাদ!” কয়েকটি
ছেলে আবার দূর
থেকে শিবা-কণ্ঠে
জিগির দিলে—“বল
হরি—হরিবোল!”

ত্রিপাঠী মশায়ের
তখন গৃহিনীর
রসিকতার কথা মনে
পড়ে গেল,—সেই

সতীন জোগাড় করে নিয়ে যাবার কথা!

কিন্তু এ যে একেবারে পাণ্ডব-বর্জিত দেশে গঙ্গা যাত্রার
আয়োজন!

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর মনে যে আলোড়নই জাগুক, ছেলেরদের উৎসাহ তার চাইতে অনেক বেশী। তারা হুম্-হুম্ শব্দে তাঁকে একেবারে খেলার মাঠে নিয়ে এসে ধপাস্ করে নামিয়ে দিলে। খানিকটা কাদা ছিটকে উঠে ত্রিপাঠীর মুখে-চোখে লেগে গেল—কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাবল্যে সে ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী চেয়ে দেখলেন, মাঠে কাদা-জল থৈ-থৈ করছে, আর কতকগুলি ছেলে উন্মাদের মতো তারই মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে।

মুখপাত্রের বিনীত ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। তিনি ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্যের সম্মুখীন হয়ে ব্লেন, আঙ্কে, এর পর বড্ড অন্ধকার হয়ে যাবে—আপনি খেলাটি শুরু করিয়ে দিন।

ত্রৈলোক্য বুঝলেন, আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন, ফুটবল ম্যাচ ত’ হবে—কিন্তু বল কোথায় তোমাদের ?

পরম উৎসাহে কয়েকটি ছেলে ছুটে গিয়ে গোটা কয়েক বাতাবী লেবু এনে মাঠের মাঝখানে ফেলে দিলে ; ব্লেন, আমাদের কিন্তু সহরের মতো গাঁটের কড়ি খরচ করে ফুটবল কিনতে হয় না। গাছে ফলে আমাদের বল ; যত খুশী খেলো, আবার ফেটে গেলে তক্ষুনি বদলে নেয়া চলে।

ত্রিপাঠী আবার বুঝলেন, তিনি তাঁর লেখনীতে যতই ঝাল মেশান এখানে তাঁর জারিজুরি একেবারেই খাটবে না। প্রতিবাদ করে কথা বলতে গেলে গাট্টা খেতে হবে! সুতরাং সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ছেড়ে দেয়াই পণ্ডিতের উপদেশ !

তিনি যদি গিলে করা আদ্রির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুৰী ধুতির মায়া কংতে যান তবে প্রাণ তাঁর থাকবে না। ইতিমধ্যে চক্চকে পাশ্পশুর দশা যে কী হয়েছে সেটা আড় চোখে একবার দেখে নিয়েছেন !

মুখপাত্র বলেন, মালকৌঁচা মেরে নিন্ ত্রিপাঠী মশাই, নইলে সারা মাঠে আপনি রেফারী হয়ে ছুটোছুটি করবেন কি করে ?

মুখপাত্রের দিকে ত্রিপাঠী একবার তাকালেন। আগেকার মুনি-ঋষির মতো তাঁর যদি ভগ্ন করবার ক্ষমতা থাকতো তবে মুখপাত্র এক গাদা ছাইয়ে পরিণত হয়ে যেতেন ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না,—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সত্যি সত্যি মালকৌঁচা মেরে কাদায় ভরা মাঠে বাতাবি লেবুর ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেফারি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন !

যেখানে-সেখানে কাদা গোলার মধ্যে বাতাবি লেবু এসে পড়ে আর ত্রিপাঠী মশায়ের যে মূর্তি হয় তা দেখলে তাঁর যে কোনো ভক্ত একেবারে মুচ্ছা যেতো ! কিন্তু এখানে খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার কিংবা ক্যামেরাম্যান নেই যে, বিবরণী দেবে—বা ফটো তুলে নেবে !

সুতরাং ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একেবারে প্রাণপণে রেফারী হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন—একবার একটি 'পেনালটি স্ট্র' ছুটে গিয়ে ঘোষণা করতে গিয়ে যাকে বলে একেবারে পা পিছলে আলুর দম !

'হাফ টাইম' হতে সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ছেলেরা বলে ত্রিপাঠী মশাই, দুটো লেবু খান, আপ'ন গোটা মাঠটা ছুটোছুটি করেছেন !

লেবু না খেতে বলে যদি খাবি খেতে বলা হত তাহলেই বোধ করি সত্যিকারের বুদ্ধিমানের কাজ করা হত। ত্রিপাঠী মশাই কাঠ-হাসি থেসে জবাব দিলেন, কিছুই খেতে হবে না ভাই! তোমাদের সঙ্গে মাঠে নেমে যে প্রেরণা পাচ্ছি তা আমি ভাষায় জানাতে পারবো না! মনে হচ্ছে—যেন আবার হারানো ছেলেবেলা ফিরে পেয়েছি!

ছেলেবা প্রবল উদ্বেজনায জয়ধ্বনি করে উঠল, “জয় ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর জয়!” মাঠের কাদা ছিটিয়ে সমবেত জনতা সেই জয়ধ্বনির সমর্থন জানালো।

দুটি পাশাপাশি গ্রামের টিমের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছিল। একপক্ষ যদি গোল দেয় তবে অগ্রপক্ষের সমর্থক দল রেফারীর মাথা ভাঙতে কিস্বা ঠ্যাং খোঁড়া করতে ছুটে আসে!

অতি সাবধানে ত্রিপাঠী মশাই ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তাকিয়ে গুরু-দায়িত্ব সমাধা করতে লাগলেন। কোন উপন্যাসে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করবার ব্যাপারেও তাঁকে এত বেশী মাথা ঘামাতে হয় নি! আর যাই হোক পৈত্রিক প্রাণটী নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে ত’! নইলে যে গৃহিণীর হাতের নোয়া আর শাখা কোনো মতেই অক্ষুণ্ণ থাকবে না। নিজের জন্তু না হোক তাঁর স্ত্রীর জন্তেই তাঁকে জীবন ধারণ করতে হবে। বেচারীর আবার মৎস্যহীন-অন্ন মুখে রোচে না। হায় নারি, তুমি যদি জানতে যে কোথায় ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন তা হলে বৃন্দাবনের রাধার মতো তাঁর ট্যাঙ্কির টায়ার ধরে পড়ে থাকতে, কিছুতেই স্টেশনের দিকে এগুতে দিতে না!

বাঙলা দেশের খ্যাতনামা লেখক ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর চোখের জল ‘নাকে দড়ি’ গ্রামের কাদা ভরা মাঠে ঝরে পড়ল ইতিহাসে তার কোনো সাক্ষ্যই আর রইল না !

যে লেখক হাজার হাজার পাঠককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে চোখের জল ফেলতে বাধ্য করেছেন—তঁার আজ এই দশা !

একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ !

তবু ত্রিপাঠী মশায়ের ধৈর্য্যের প্রশংসা করতে হবে। কেননা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখানে মাথা ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন ; নইলে পাড়ারগায়ের ডাঙার কাছে মাথার মায়া একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ছুই পক্ষই ছুটি করে গোল খেয়েছে। কেউ আর শেষ পর্যন্ত শোধ দিয়ে খেলার গতি অণুদিকে ফিরিয়ে দিতে পারল না।

যে কোন একটি পক্ষ যদি জয়লাভ করত—তবে বিজিত পক্ষ এসে যে ত্রিপাঠী মশায়ের মাথা ভেঙে দিত সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কিন্তু সমান ফল হওয়ায় ত্রিপাঠী মশায়ের আদর ছুই দলেব কাছে অব্যাহত থাকল এবং ছুটি দলই তাঁকে টানাটানি করতে লাগলো খাওয়ার জন্যে।

গ্রামের মুখপাত্র মশাই খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে মিথ্যে গুন্মোর করেন নি। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জল খাবারের যে আয়োজন চোখে পড়ল তা দেখে কল্কাতার রেশনের মানুষ ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠীর চোখ ছুটি একেবারে গোলালু হয়ে উঠল !

বাগানের বহুবিধ ফল—আর সেই সঙ্গে ছানার পায়ের থেকে শুরু করে বহুরকম ঘবে তৈরী মিষ্টি ।

ঔপন্যাসিক মশাই মনে মনে ভাবলেন, এই মুখরোচক পদার্থগুলি পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গেলে মন্দ হত না ! তবু এতক্ষণ ধরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সারা মাঠ চষে তাঁর ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব, সুতরাং বেশী বাক্য-ব্যয় না করে ডানহাতের কাজ বেশ ভালোভাবেই শুরু করে দিলেন ।

রাত্তিরে আবার দুইদলে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল—‘রেফারী’ কোথায় নৈশ-ভোজ সমাপ্ত করবেন—তাই নিয়ে । একদল যদি বলে, আমরা পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরিয়েছি—অমনি অপর পক্ষ হংকার দিয়ে ওঠে, আমাদের পাঁটা কাটা হয়ে গেছে ! কথা কাটাকাটি থেকেই হাত গুটোনো—তারপরই প্রায় ঘুষোঘুষি শুরু হয় আর কি ! ত্রিপাঠী মশাই মাঝখানে পড়ে বলেন, ‘জু’ দলের রান্নাই এক জায়গায় বসে খাবো,—কারো কোনো ক্রোভ রাখবো না । প্রাণ যদি যায় তবে খেয়েই যাক্ ।

দুই দল তখন মহা খুশী !

কল্কাতায় ফিরে এসেই ত্রৈলোক্য ত্রিপাঠী একটি বিবৃতি সব কাগজে পাঠিয়ে দিলেন । ছাপা হলে দেখা গেল—তাঁর বিবৃতিটি এই রকম :

বাঙলা দেশে সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সকলেরই অল্প-বিস্তর অর্থাগম হয় ; সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে দণ্ডরীও তাঁর পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে । কিন্তু স্রষ্টা-সাহিত্যিক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিয়ে

কিংবা সভাপতিত্ব করে একটি কানাকড়িও লাভ করতে পারেন না।
তাই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি যে, আজ থেকে প্রতি সভায়
সভাপতিত্বের জন্যে নগদ ১০১ টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করবো।
ডাক্তার যদি ফাঁ নিতে পারেন, সাহিত্যিক কি দোষ করলেন তা
আমি বুঝতে পারি না! তাঁর সময়ের মূল্য আরো বেশী। আরো
একটি জরুরী ঘোষণা আছে। পল্লী-অঞ্চলে সভাপতিত্ব করতে
হলে সেই প্রতিষ্ঠান সাহিত্যিকের জীবন-বীমা করতে বাধ্য থাকবেন।
বলাবাহুল্য প্রিমিয়াম উক্ত প্রতিষ্ঠানকেই যোগাতে হবে। অলমিতি
বিস্তারণ।

ঘোষণাকারী—

শ্রীতৈলোক্য ত্রিপাঠী

(সাহিত্য ধূরন্ধর)



তিসির কারবারী হরিহর ভাগুরী যখন বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করলেন...পাড়ার পাঁচজন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন বলেই মনে হল।

হরিহরবাবু সারাজীবন ব্যবসা চালিয়ে টাকা জমিয়েছেন যেমন প্রচুর, তেমনি তাঁর বয়সেরও গাছপাথর ছিল না। পাড়ার

মাতব্বরেরা সাম্নে খাতির করত, আর আড়ালে-আবড়ালে বলত, বুড়ো অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে এসে যথের ধন আগলাচ্ছে। মরলে যে শ্রাদ্ধে ভরপেট লুচি-মণ্ডা খাৰো—তার কোনো হৃদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই হরিহরবাবু যখন স্বাধীনতা দিবসে নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে চিত্রগুপ্তের কাছে সারা জীবনের হিসেব-নিকেশ দিতে চলে গেলেন তখন একজন বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে অভিমত প্রকাশ করলেন—
আহা! স্বাধীনতার হাওয়া ভদ্রলোকের সইল না। একে প্রচুর টাকার গরম তায় স্বাধীনতার উত্তাপ, হরিহরকে পটল তুলতেই হল!

হরিহরের একমাত্র ছেলের নাম হচ্ছে রামহর। কিন্তু মুঞ্চিল হ'ল এই যে, রামহর ম্যাট্রিক পাশ করে মাস ছয়েক কলেজে যাতায়াত করেই স্থির করে ফেল্ল যে, 'রামহর' নামটি অতি সেকেলে। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন জানিয়ে সে রাতারাতি সেই পচা পুরোনো সেকেলে নামটি পরিবর্তন ক'রে নিজের নতুন নামকরণ করলে 'ঝিলিক'।

হরিহরের মৃত্যুর পর ঝিলিক ভাণ্ডারী পাড়াব 'হিরো' হয়ে উঠল।

পাড়ায় সার্বজনীন ছুর্গোৎসব হবে—ঝিলিক ভাণ্ডারী তার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। পাড়ার ছেলেরা অবৈতানক নাট্য-সম্প্রদায় গড়বে—ঝিলিক ভাণ্ডারী তার পরিচালক; এতদিন সেই অঞ্চলে যে পার্শ্বালাটা টিম্‌টিম্‌ করছিল—বুদ্ধিমান পণ্ডিতমশাই একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে ঝিলিককে তার সেক্রেটারী করে দিয়ে

এলেন। অন্ততঃ মাস গেলে পণ্ডিতমশাই নিজের মাইনেটা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

এমনি ভাবে সকল দিক থেকে সবাই মিলে যখন ঝিলিকের তরুণ মাস্তুল চর্চন করতে তৎপর হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল—ঝিলিকের ছোটগামা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন এসে তার দিদিকে বোঝালে যে, ভাগ্যারীমশাই পরিণত বয়সেই পরলোকের ডাকে চলে গেছেন—সেজন্য শোক করবার কিছু নেই। কিন্তু সাত-ভূতে মিলে তার ভাগ্নের কচি মাথাটা সে চিবিয়ে খাবে সেটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। আর সেইজন্য সে তার সমস্ত কাজ-কর্ম আর ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে দিদির এই বিপদে না এসে থাকতে পারে নি।

সত্যি কথা বলতে কি, বাপের মৃত্যুর পর থেকে ঝিলিক যে ভাবে ছুঁহাতে টাকাগুলি ‘নয়-ছয়’ করছিল তাতে ঝিলিকের মা বিশেষ শঙ্কিতই হয়ে পড়েছিলেন। এখন ভাইকে নিজের পাশে দেখে আকাশের চাঁদ যেন হাতের মুঠোয় খুঁজে পেলেন।

—বৃন্দাবন এসে পড়েছে, এখন সেই আমাদের ভরাডুবি থেকে বাঁচাবে—এই রকম একটা ভাব হরিহর গৃহিণীর মুখে ফুটে উঠল।

দিদিকে নিশ্চিত করে বৃন্দাবন ভাগ্নের খোঁজে বৈঠকখানায় এসে হাজির হল।

বয়েস হতেই ভাগ্যারী মশাই অবশ্য কারবার গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা, নিজের হাতে অপর কেউ এসে তামাক খেয়ে যাক্ এটা তিনি আদপেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর

সঙ্কিত অর্থ যে ক্রমাগত ছা-পো বিয়িয়ে চলছিল সে কথা কারো অজানা ছিল না !

দান-ধ্যান করাটাকে তিনি অপব্যয় বলেই মনে করতেন ; তার ভ্রুভঙ্গিকে ভয় করে ভিখিরী-বষ্ট্রুমেরা বাড়ীর ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না ! এহেন ভাগ্যরী মশায়ের বৈঠকখানা এখন বঙ্কিমী ভাষায়—“কাক-সমাকুল বটবৃক্ষের ত্রায় সর্বদা শব্দিত হচ্ছিল ।”

বৃন্দাবন দু’দিন ভাগ্নের মজলিসে যোগদান ক’রে বুঝতে পারল যে, ভাগ্নের প্রকৃত ‘প্রাইভেট সেক্রেটারী’ হচ্ছে—চঞ্চল বলে একটি ছেলে—শ্রীমানেরই কলেজের সহাধ্যায়ী ।

বিভিন্নমুখী আলোচনায় মজলিস-কক্ষ ক্ষণে-ক্ষণে মুখরিত’ হয়ে উঠছিল ।

আলোচনার বিষয়—রেশন, মন্ত্রিমণ্ডলী, সিনেমা, মোহনবাগান, দাঙ্গা থেকে শুরু করে সুদূর ষ্ট্যালিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কোন্ দিন যে কোন্ বিষয় প্রাধান্য লাভ করবে সেটা আগে থেকে বলা শক্ত । আবহাওয়া-ঘোষণাকারীদের ভবিষ্যৎ-বাণীকে বার্থ করে দিয়ে ঝড়-বুষ্টির রাস্তা যেমন অল্প দিকে ধাবিত হয়, ঠিক সেই রকম এই মজলিসের আগোচ্য বিষয়ের ‘ব্যারোমিটার’ কোনো আইন-কানুন না মেনে অকাবণেই ওঠা-পড়া করতে থাকে ।

বুদ্ধিমান বৃন্দাবন বুঝতে পারল যে, এই ‘ব্যারোমিটার’কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সকলের আগে চঞ্চলকে হস্তগত করতে হবে ।

কাজেই ভাগ্নেকে আয়ত্তে আনবার আগে চঞ্চলের সঙ্গে সে গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে ফেলে ।

প্রতিদিনকার মজলিসে যে ধুমায়িত চা আর তপ্ত চপ্-কাটলেট

সরবরাহ করা হয়—তার আদেশ দেবার মালিক হচ্ছে—চঞ্চল। কাজেই ভাগ্নের মজলিসের দাবা খেলায় শ্রীমান চঞ্চল হচ্ছে আসল ‘মন্ত্রী’। এই মন্ত্রীটিকে সর্বাত্মে হস্তগত করা দরকার।

বৃন্দাবন খবর নিয়ে জান্নল যে, কুক্ষিত কেশধারী সুদর্শন চঞ্চল অতি সাধারণ ঘরের ছেলে এবং সংসারে তার অভাব আছে।

কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি সে একদিন চঞ্চলের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল।

ঝিলিকের মামা তার বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছে—চঞ্চল কৌথায় তাকে বসাবে, কি যেতে দেবে ঠাহর করতে না পেরে হুকু-চকিয়ে যায়।

বৃন্দাবন মুহূ হেসে বলে, কিচ্ছু তোমার ব্যস্ত হতে হবে না ভায়া, ঝিলিকের বন্ধু তুমি...তুমিও আমার ভাগ্নে, বুঝলে ?

চঞ্চলও ইতিমধ্যে কানা-ঘৃষা শুনতে পেয়েছিল যে, মাতুল বৃন্দাবন অভিভাবক হিসেবে ঝিলিকের বিরাট সম্পত্তির রাশ টেনে ধরবে। নেহাৎ বরাং খারাপ হলে ওখানকার অল্প-জল বন্ধ হয়ে যেতেও পারে। সুতরাং মাতুলকে যে খুশী করা প্রয়োজন, সে কথা কদিন থেকেই সে ভাবছিল।

চঞ্চলের পক্ষে এ একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। সুতরাং বৃন্দাবনের স্নেহসিক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা চঞ্চলের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। নইলে আবু-হোসেনের বাদশাগিরি ছাঁদিনেই খতম হয়ে যেতে পারে।

পাঁচ মিনিট আলাপের পর বৃন্দাবন আর চঞ্চল স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে বুঝতে পারল যে, তারা রতনে-রতন চিনেছে ! ভাবনার আর কোন কারণ নেই ।

তখন বৃন্দাবন চঞ্চলের বাবার হুকোটা ধরিয়ে নিয়ে আমেজ ক'রে দুটো সুখটান দিয়ে বলে, তবে বলি শোনো বাবাজি, দুটি প্রাণের কথা তোমায় কই । বড় লোকের ছেলে, প্রচুর টাকা । এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হবে । হবে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ । পাড়ার সবাই যদি লুটে-পুটে নেয়—আমারই বা বাদ যাবো কেন ?

সাহস পেয়ে চঞ্চল বলে, সে ত' সত্যি কথাই মামাবাবু ।

হা-হা ক'রে অট্টহাস্যে ভেঙে প'ড়ে বৃন্দাবন জবাব দিলে, মিছে কথা বৃন্দাবন কয় না, এইটুকু তুমি জেনে রাখো বাবাজি । দ্বিজু রায় কি বলে গেছেন জানো ত ?

“হরির কুপায় দশজনে খায়

আমরা কেন গো খাব না ?”

তাই আমাদের দু'জনের খাবার ব্যবস্থা ভালো ক'রে করতে হবে । তবে এটা তুমি জেনো বাবাজি যে, আমার ভাগ্নের তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না । সমুদ্রের জল—এক গণ্ডুষ গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি ?

চঞ্চল এইবার একটি রসিকতা করবার চেষ্টা ক'রে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, যাকে বলে বোঝার ওপর শাকের জাঁটি ।

অট্টহাস্যে নিজের সমর্থন জানিয়ে বৃন্দাবন পুনরায় ঘন-ঘন হুকো টেনে ধোঁয়ায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে ।

চোখে-মুখে তার কৌতুক নেচে বেড়াতে লাগল । বৃন্দাবন পুনরায় শ্রুত করলে :

তোমার সঙ্গে ‘প্যাক্ট’ যখন হয়ে গেল...তখন আমার প্ল্যানটা শুনে রাখো বাবাজি। আমি যখন প্রস্তাব তুলবো তোমাকেই তা সমর্থন করতে হবে।

চঞ্চল শুধোলে, প্ল্যানটা কি বলুন ত’ মামাবাবু—? বৃন্দাবন গলা খাটো ক’রে বললে, সিনেমা কোম্পানী খুলতে হবে—হা-হা-হা—

চঞ্চল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সিনেমা কোম্পানী ? সে ত’ অনেক টাকার দরকার।

বৃন্দাবন জবাব দিলে, তা অনেক টাকা নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে বৈ কি ! এই যে প্রত্যহ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব রাখছে কে শুনি ? শোনো বাবাজি, তুমি আর আপত্তি তুলো না। আগেকার দিনে বড় লোকের ছেলেরা হঠাৎ সম্পত্তি হাতে পেলে বাগান-বাড়ী-পর্ব শুরু ক’রে দিত...আর আজকালকার দিনে ফেঁদে বসে সিনেমার ব্যবসা। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে শুনি ? তুমি হবে ডিরেক্টর আর আমি হবো প্রোডাকশন্ ম্যানেজার। তার পর যদি সুবিধে মত একটি হিরোয়িনের সঙ্গে বাবাজীর যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি, তবে আমাদের বাড়ি ভাত খায় কে ?

আপন রসিকতায় বৃন্দাবন আপনিই হাসতে লাগলো। এর সঙ্গে লাগ-সই একটা ফোঁড়ন না দিলে ভালো দেখায় না বিবেচনায় চঞ্চল চুটকি দিয়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন মামাবাবু, “বর্বরস্য ধনক্ষয়ম।”

বৃন্দাবন চোখ বুজে কথাটা আশ্বাদন ক’রে জবাব দিলে, নিশ্চয় ! এই যে প্রত্যহ চপ-কাট্লেট আর চা উড়ছে...এতে কোন্ দেবতার নৈবিদ্যি সাজানো হচ্ছে শুনি ? এ হ’ল আরো ভালো। দশটা

লোকের অন্ন হবে,—আমরাও কাজ গুছিয়ে নিতে পারবো। তুমি আর অমত কোরো না বাবাজি। আজ রাত্রেই আমি প্রস্তাব তুলবো। এসো, হাতে হাত দাও।

বৃন্দাবন আর চঞ্চলের অলিখিত প্যাক্টের স্বাক্ষর হয়ে গেল। চঞ্চল বলে, মামাবাবু, একটু চা খেয়ে যাবেন না ?

বৃন্দাবন জবাব দিলে, আজ তামাক পর্য্যন্তই থাক্ ভায়া, পরে একদিন পাত পেতে বসে চেয়ে খেয়ে যাবো। দাঁড়াও, আগে তোমায় ডিরেক্টর ক’রে দিই।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হ’ল যে, সিনেমা-ব্যবসার সূত্রপাত করতে হবে এবং তখনি ‘বিলিক্-চিত্র প্রতিষ্ঠানের’ নামকরণ-উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিলিক্ বলে, শোনো মামা, ব্যবসা আমি ঠিক চালিয়ে যাবো, তবে নায়কের ভূমিকায় কিন্তু আমায় নামাতে হবে।

তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বৃন্দাবন বলে, সে কথা আর বলতে বাবাজি ! তোমার জন্মে আমি সাগর-ছেঁচা-মাণিক নিয়ে এসে ছবির নায়িকা ক’রে দেবো। ‘হিট্-পিক্চার’ যদি না হয় তবে তুমি আমার নামে কুকুর পুষো বাবাজি !

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাইরের বৈঠকখানা-ঘরটিকে চেয়ার-টেবিল, সোফা, টাইপ-রাইটার, ফাইল, ‘হোয়াট্-নট্’ প্রভৃতিতে কটকিত ক’রে তুলে ‘বিলিক্ চিত্র-প্রতিষ্ঠানের’ অফিসে রূপান্তরিত করা হ’ল।

বিলিকের সঙ্গে পড়ত একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। তাকে কোম্পানীর টাইপিষ্টের পদে বাহাল করা হ’ল। পুরুষ ভূমিকাগুলির

জ্ঞাত্রে কোনো ভাবনার প্রয়োজন নেই। পাড়ায় যে অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল তার বেকার সভাদল এসে অফিস-গৃহ জাঁকিয়ে তুললো। শুধু প্রয়োজন তিলোত্তমা-সদৃশ একজন নায়িকার।

চঞ্চল প্রস্তাব উত্থাপন করল যে, খেঁদি-পেঁচৌকে নায়িকার ভূমিকা দেয়া হবে না। শিক্ষিতা, উচ্চবংশ-সম্মুতা, কৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিকাকে নায়িকারূপে বাছাই ক’রে নিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ’ল।

পরের দিন ক’ল্কাতার বিভিন্ন দৈনিকে এই বিজ্ঞাপনটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল :

তারকা-তল্লাসে

‘ঝিলিক চিত্র প্রতিষ্ঠান’র প্রাথমিক ‘হিট পিকচার’ ‘প্রথম দর্শনে প্রেম’ ছবিটির জন্য সর্বমূলক্ষণযুক্ত তারকা আবশ্যক। উচ্চশিক্ষিতা, সঙ্গীতজাতা, কৃষ্টিসম্পন্ন, সঙ্গীত ও নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রীর প্রয়োজন। ফটোসহ আবেদন করিলে চলিবে না। স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে হইবে। চিত্রের নায়ক নিজে নায়িকা নির্বাচন করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ, ঝিলিক চিত্র প্রতিষ্ঠান

১২।৩ এ, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা।

খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হবার পর থেকে ঝিলিকের বাড়ীতে কালো, মোটা, লম্বা, সরু, হাড়গিলে, অস্থিচর্মসার, দোহারা, দাঁত-উঁচু, থ্যাংড়ানাকী প্রভৃতি যেরকম নারীসমাগম হতে সরু হ’ল তাতে ঝিলিকের মা প্রমাদ গগলেন এবং পাড়া-পড়শীর দল নিজেদের

অবিবাহিত ছেলেদের সম্পর্কে ভয় পেয়ে পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিলেন।

ঝিলিকের মা অন্তঃপুরে ছেলেকে ডেকে পাঠাতে সে বলল, মা, তুমি কিছু মাত্র ভয় পেয়ো না। বাবা তিসির ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন; সত্যি কথা। কিন্তু এখন যুগ পাল্টে গেছে। তিসি নিয়ে কারবার করলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো চলে না। এই সিনেমার ব্যবসা ক’রে আমি তোমার পূজোর ঘর সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো। তুমি সোনার বেলপাতা দিয়ে মহাদেবকে পূজো করো।

ভাণ্ডারী-গৃহিণী ছেলের কথা শুনেই হোক্ অথবা সোনার বেলপাতা দিয়ে মহেশ্বরের পূজোর প্রলোভনেই হোক্...চুপ ক’রে রইলেন। ও দিকে বৃন্দাবনের উৎসাহের বিরাম নেই।

কি ভাবে মহরং অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে সেই পরিকল্পনা নিয়ে তার স্নান-খাওয়ার সময়ের অভাব ঘটতে লাগলো।

এই উৎসবের ‘মেনু’ রচনার ভার পড়েছে চঞ্চলের ওপর। সে তদনুসারে এক বিরাট তালিকা তৈরী ক’রে ফেলেছে, কাজও শুরু হয়ে গেছে।

কৃষ্ণনগর থেকে আসছে সবপুরিয়া, বর্দ্ধমান থেকে সীতাভোগ আর মিহিদানা, ঈশ্বরদীর ছানার জিলিপি, মোল্লার চকের দৈ, ‘আবার-খাবো’ সন্দেশ, সরেস রাবড়ী—তা ছাড়া চপ, কাটলেট, ডেভিল, পুডিং প্রভৃতির আয়োজনেও ত্রুটি নেই।

কিন্তু মুষ্কিল বাঁধালো নায়িকা।

‘প্রথম দর্শনে প্রেম’ ছবির নায়িকা-নির্বাচনে সত্যি গোলমাল বেঁধেছে।

এ একটা বিরাট সমস্যা বলতে হবে।

কেন না—এক্ষেত্রে পরিচালক নায়িকা নির্বাচন করছেন না—
মনোনয়নের দায়িত্ব নিয়েছে নায়ক নিজে।

অথচ মহরতের নির্দিষ্ট দিন ঘনিয়ে এলো। ছুড়িয়োতে টাকা
জমা দেয়া হয়েছে ; নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হয়ে এসেছে। বাইরের
অধিকাংশ মিষ্টিও এসে পড়েছে। কালীঘাটে বিশেষ পূজোর ব্যবস্থাও
ঠিক করে ফেলা হয়েছে, অথচ নায়কের প্রথম-দর্শনে-প্রেম ঘনীভূত
হচ্ছে না।

চিত্র জগতে এর চাইতে বড়ো ট্রাজেডী আর কি হতে
পারে ?

সেই দিন গভীর রাত্রে বৃন্দাবনের সঙ্গে চঞ্চলের কথা
হচ্ছে।

তামাক টানতে টানতে উৎসাহের সুরে বৃন্দাবন চঞ্চলকে
জিজ্ঞেস করলে, একটা ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করেছ ভায়া ?
চঞ্চল চাঞ্চল্য প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলে, কি বলত
মামাবাবু ?

বৃন্দাবন চোখ টিপে বললে, মিঠাই-মণ্ডার চিন্তায় রাত দিন
বিভোর হয়ে আছ, আরো সব মিষ্টি ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি
দিও।

চঞ্চল পুনরায় নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে বৃন্দাবন বললে,
কদিন থেকে লক্ষ্য করেছি আমাদের টাইপিষ্ট পাম্লির সাথে
আমার ভাগনের গুজ-গুজ ফুস-ফুস লেগেই আছে। চিঠি টাইপ
করার কাজ বাবাজীর যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তুমি Out door

এর লোক কি না তাই In door affair-এর দিকে দৃষ্টিপাত
করবার অবকাশ পাও নি !



চঞ্চল অসহিষ্ণু হয়ে
জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু
আ মা দে র না য়ি কা
সমস্তার সমাধান তা
হলে কি করে হবে ?

হো-হো করে হেসে
উঠে বৃন্দাবনজবাব দিলে,
সমস্তার সমাধান 'ত'
ওরই মধ্যে লুকিয়ে
রয়েছে। কোনো আপত্তি
কোরো না বাবাজি,
পাম্লীকেই আমরা
নায়িকা নির্বাচন করবো।

—আপনি বলছেন কি মামাবাবু ? চঞ্চলের মুখ থেকে একরাশ
বিস্ময় ধোঁয়ার মত বেরিয়ে এলো। পাম্লী ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান
মেয়ে, ও বাংলা বলবে কি করে ?

বৃন্দাবন জবাব দিলে, যা বলবে তাতেই আমাদের কাজ হয়ে
যাবে। 'প্রথম দর্শনে প্রেমের' নায়িকা হচ্ছে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের
মেয়ে। ভাঙা বাংলার সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে তৈরী করবে
তার 'ডায়ালগ'; হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে
রয়েছ কি ?

চঞ্চল ভয়ে ভয়ে বল্লে, কিন্তু ছবির তাতে একেবারে বারোটা বেজে যাবে !

বৃন্দাবন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত নিক্ষেপ ক’রে উত্তর দিলে, তা বাজুক...আমরা সেই ফাঁকে আমাদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারবো। বুঝতে পারলে না বাবাজি? প্রথম দর্শনে প্রেম! সেটাকে ত আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে।

চঞ্চল এইবার উৎসাহিত হয়ে বল্লে, না, তা ছাড়া আর কি করতে পারি মামাবাবু?

বৃন্দাবন এইবার খুশী হয়েছে বলে মনে হল। হুঁকোতে আর একট্রি সুখটান দিয়ে বল্লে, “যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে?... হরে মুবারে।”

মায়াপুরী ঠুড়িয়োতে সন্ধোবেলা “বিলিক চিত্র প্রতিষ্ঠানে”র প্রাথমিক চিত্র-নৈবেদ্য “প্রথম দর্শনে প্রেম” চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠান।

একটি ফ্লোরকে এজ্ঞা আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়েছে। নানা বেশভূষা পরিহিত হরেকরকম স্ত্রী-পুরুষ উৎসব প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হচ্ছেন, আর বাইরের রাস্তায় মোটরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনুষ্ঠান অন্তে একটা মোটরের শোভা-যাত্রাই হয়ত বের করা হবে।

গ্রামোফোন রেকর্ডে যত প্রেমের গান আছে তার থেকে বাছাই ক’রে একশ-এক “উচ্ছ্বসিত প্রেম-সঙ্গীত” চঞ্চল বাছাই ক’রে নিয়ে এসেছে। ‘লাউড স্পীকারে’ একটার পর একটা তাই বাজনো হচ্ছে। যারা শুনছে তারা মোহিত হয়ে প্রেমে পড়ার প্রেরণা

লাভ করছে...আর বেরসিক দল সিগারেট টেনে আর পান চিবিয়ে
কোনো রকমে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে।

নিমন্ত্রিত মহিলাদল নিজেদের গহনা আর রসনার কাহিনীতে
পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন।

এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে সেই পীঠস্থানে প্রবেশ করলো
প্রডাক্সন্ ম্যানেজার বৃন্দাবন। ডান হাতে তার মা-কালীর মন্দিরের
সিঁহুর-সিক্ত বিদ্বপত্র আর বাঁ হাতে প্রসাদী প্যাড়া।

ক্যামেরার কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হল জবাফুলের মালা।
পরিচালক তৎপর হয়ে উঠেছেন।

ক্যামেরাম্যান আলোক নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছেন। সকলের
দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে নিবদ্ধ...

কিন্তু হা-হতোশ্মি...

নায়ক-নায়িকার দেখা নেই!

‘প্রথম দর্শনে প্রেম’র মধু-লগ্ন কি এইভাবে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে!

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে যুহু-গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো।
পরিচালক চঞ্চল এসে প্রডাক্সন্ ম্যানেজার বৃন্দাবনকে শুক্লো
মুখ নিয়ে শুধোলো, মামাবাবু তাহলে এখন উপায়?

বৃন্দাবন বললে, ভয় কি বাবাজি...এক্ষুণি ওরা এসে যাবে।
বুঝতেই ত পারছ ‘প্রথম দর্শনে প্রেম’! একটু বাড়াবাড়ি ত’ হবেই।
তুঁাম বরঞ্চ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে খাবারের প্লেট বিলিয়ে দাও, তা
হলে সকলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

বৃন্দাবন মিছে কথা বলে নি।

খাবারের প্লেট বিলি হবার সঙ্গে সঙ্গে কুপিতা নাগিনীর মাথায়
যেন মস্তুর পরা হল।

চাকুম-চুকুম শব্দে ‘ফ্লোর’ মুখরিত হয়ে উঠল।

এমন সময় এক ভগ্নদূত এসে বৃন্দাবনকে খবর দিলে, নায়ক-নায়িকা দার্জিলিং চলে যাচ্ছে।

পরিচালক খবর শুনে উন্টে পড়ে যাচ্ছিল! বৃন্দাবন তাকে ধরে সিঁধে করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

এমন সময় একখানা বাড়ীর গাড়ী দ্রুতগতিতে সেইখানে এসে হাজির হ’ল।

একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে উঠল—এসেছে এসেছে...

বৃন্দাবন ছুটে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই তার থেকে বেরিয়ে এলেন ঝিলিক জননী!

তিনি হয় ত লুচি বেল্ছিলেন। হাতে পাথরের শক্ত আর মোটা বেলুনী।

খবর পেয়ে সেই অবস্থাতেই গাড়ী করে চলে এনেছেন।...

বৃন্দাবনকে সামনে পেয়েই তিনি চীৎকার ক’বে উঠলেন, তুই আমার সর্বনাশ করতেই এসে জুটেছিস...তারপর সেই পাথরের বেলুনী তড়িৎগতিতে এসে পড়ল তার মাথার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন পপাত ধরণী তলে!

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হ’ল।

চঞ্চল ঝিলিক-জননীর রণ-রঙ্গিণী মূর্তি দেখে আত্মরক্ষার জন্য একটি থামের আড়ালে লুকিয়ে কাঁপছিল আর ছুর্গানাম জপ করছিল; এইবার আড় নয়নে বৃন্দাবনের অবস্থা দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বল্লে, হ্যাঁ একটা ‘হিট পিকচার’ বটে!

ক্যামেরাম্যান বল্লে, নিশ্চয়। এক মিনিট! ব্যাপারটা ক্যামেরায় তাড়াতাড়ি তুলে নি!



অতিবড় দুঃখের মধ্যেও যে কি ভাবে অতি কৌতুকজনক এক-
একটি কাণ্ড ঘটে থাকে, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুধু এই
কথাই বলা চলে যে, বিধাতা বোধ করি দৈনন্দিন কাজে ঘর্মাক্ত
হয়ে অবসরে চিন্তা-বিনোদনের জন্মে একটুখানি রসিকতা করবার
চেষ্টা করছেন !

বাঙালারামের সঙ্গে টেঁপীর পরিচয় রাণাঘাট প্ল্যাটফর্মে ।

ইতিপূর্বে বাজারাম পাকিস্তান থেকে আগত বহু উদ্বাস্তর মাল বয়ে দিয়েছে, রোগ-কাতর লোককে কাঁধে করে নিয়ে গেছে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে, দুর্গতদের মধ্যে পুরোণো কাপড় বিলি করেছে, রেশনের ব্যবস্থা করেছে আপ্রাণ পরিশ্রমে, কিন্তু এমন মন-উচাটন কখনো তার হয়নি।

ব্যাপারটাকে জটিল বলতে পারা যায়। অত্যাণ্ড দিনের মতো বাজারাম রাণাঘাট ষ্টেশনে সেবাকার্যে রত ছিল। সিরাজগঞ্জের ট্রেন এলে মেয়েদের একটা কামরা থেকে হাউ-মাউ কান্না শুনে বাজারাম সেই দিকেই এগিয়ে গেল। আজকাল নানারকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এমনিই ত' পূর্ববঙ্গ থেকে সবাই সব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে, তার ওপর কতকগুলি দুঃস্থ-প্রকৃতির লোক সুবিধে বুঝে অনেকের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় নিয়ে সরে পড়ছে। সেবাকার্য্য করতে এসে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে এমন উদাহরণও আশ্রয়-শিবিরে অপ্রতুল নয়। কাজেই মুহূর্তমধ্যে কর্মতৎপর বাজারামের সজাগ কর্ণদ্বয় চঞ্চল হয়ে উঠল।

জানলা দিয়ে উঁকি মেবে দেখল—একটি পল্লীগ্রামের বয়স্কা মেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে আর চোখের জল ফেলছে !

বাজারামের স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করলে, কি গো বাছা, এমন করে হাপুস নয়নে কাঁদছ কেন ? কী হয়েছে তোমার ?

প্রশ্ন শুনে টেপীর কান্না ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হল। তারপর হঠাৎ কলের জলের মত তার অশ্রু-উৎস আবার খুলে গেল। ভেউ-

ভেউ করে সে বললে, কাঁদুম না ? এতেও যদি কাঁদন না আসে ত' চোখের জল ফেলুম কি চিতার তলায় গ্যালে ?

বাঞ্চারাম বলে, আহা বাপু, কি হয়েছে তাই বল না।

টেঁপী জবাব দিলে, নতুন কইর্যা কওনের আর কি আছে ? সর্বস্ব খুইয়্যা আইলাম পাকিস্তান থনে। আইসব্যার সময় আমার গয়নাগুলি অবধি কাইড়া রাইখল্যো।

বাঞ্চারাম উত্তেজিত হয়ে ওঠে : কে কেড়ে রেখেছে তোমার গয়না বল দেখি ? জানো, নেহেরু-লিয়াকৎ প্যাঙ্ক হয়ে গেছে ? ও সব জুলুমবাজি এখন আর চলবে না।

বাঁ-হাতের চেটোয় চোখের জল চট করে মুছে ফেলে ছুস্কার দিয়ে উঠল টেঁপী—হুঁ, অ্যাঙ্কো হইচে। তোমরা এহানে বইস্তা অ্যাঙ্কো কইরব্যা আর ওহানে আমাগো পরাণ লইয়্যা টানাটানি !

—আহা বাছা, তোমার গয়নাগুলি কে কেড়ে নিলে সেই কথা আগে বলে। বাঞ্চারামের অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

টেঁপী মুখ ঝাম্টা দিয়ে জবাব দিলে, কে আবার নিবো ? —ওই ছায়েদ আলী। আমারে কয় কিনা নিকা বয় আমার লগে। আমি হিন্দুর ঘরের মাইয়্যা, নিকা বইসতে যামু তোর লগে ? মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন, কইলাম, গয়না নিত্য্যাহিস, নে ; কিন্তু আমারে পাবি না। চইল্লাম আমি হিন্দুস্থানে। তা মুখপোড়া কয় কি—বর জোটাইতে চল্লি নাকি টেঁপী ? আমি কইলাম, নয়ত কি ? সেহানে কি মনের মাঝুঘের অভাব নাকি ?

অপাঙ্গে সে বাঞ্চারামের দিকে তাকায়। কে বলবে খানিকটা আগে টেঁপী ডাক ছেড়ে মরা-কান্না কাঁদছিল।

বাঞ্ছারাম তাকিয়ে দেখে . .

টে'পীর স্বাস্থ্যপূর্ণ নিটোল দেহ...হিন্দুস্থানের অখাছ-কুখাছ
থেয়ে তা হল্‌দে হয়ে ওঠেনি...কিন্মা বেরিবেরি সেখানে আশ্রয়
নেয়নি। পরিশ্রম করলে শরীর যে সুন্দর হয়, বাঞ্ছারামের চোখের
সামনে জ্বলন্ত উদাহরণের মতো টে'পী সে কথা নিজের অজান্তে
জানিয়ে দিল।

কিন্তু কঠোর বৈরাগী বাঞ্ছারামের সে কথা ভাববার অবসর
কোথায় ? বাপের অমতে সে সেবাকার্য্য করতে রাণাঘাট এসেছে।
...স্নান নেই, আহাৰ নেই, সময় মতো নিদ্রাও বোধ করি
নেই। কত ছেলে-মেয়েকে সে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে,
কলেরা-রোগীর মল মুক্ত করেছে, রাত জেগে বসন্ত রোগীর
শিয়রে বসে বাতাস করে মাছি-মশা তাড়িয়েছে...এই ত তার
কাজ।

যুদ্ধের চাইতেও কঠিন আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ তার হাতে। ঘরে
যখন আগুন লাগে তখন প্রেয়সীর সুন্দর মুখখানি সেই আগুনের
মধ্যে দেখবার অবকাশ জোটে কি ?

বাঞ্ছারাম ইচ্ছে করেই টে'পীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে
নিলে।

টে'পী কিন্তু ছ'পা এগিয়ে এলো। বলে, ও ভালো মাইনম্বের
ব্যাটা, আমারে একটা সুবিধামত জায়গায় থাকনের ব্যবস্থা কইর্যা
ছাও। আমি গতর খাটাইয়া কাজ করুম। ঘরের লগে জমি যদি
পাই তবে লাউডা-কলাডা ফলাইয়া তুলুম। কাজ করনে ভয় পাই
না আমি।

বাজ্জারাম জবাব দিলে, আচ্ছা, এখন তোমায় আমি কুপাস ক্যাম্পে পৌঁছে দিচ্ছি। কাল এসে দেখবো—তোমায় অন্য কোনো গেরস্ত-বাড়ীতে রাখতে পারি কি না।

টেপী এর পর আর বিশেষ আপত্তি করল না। শুধু একবার শুধোলো, তুমি আমার খোঁজ-খবর লইবা ত' ঠিক? যে মানুষের ম্যালা দেইখ্‌তাছি, তাতে গুরু খোজা করলেও চেনা মানুষ খুইজ্যা পাওন দায়।

বাজ্জারামের কেন যেন মনে হল—ভবের হাটে মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যি দায়! নইলে সেবাকার্য্য করতে এসে এই অশিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী সরলা মেয়েটি তার মনকে অকারণে টানছে কেন? কলেজে ছুঁবাসা বলে ওর একটা বাড়তি নাম আছে। কেননা, মেয়েদের সঙ্গে ও সহসা মেশে না; আর প্রয়োজনের খাতিরে কথা বলতে হলেও অকারণে কণ্ঠস্বর দ্বীর্ণ ও সুরেলা হয়ে ওঠে না। ছেলেরা বলে, তুই কি রকম কাঠখোঁট্টা রে, কার সঙ্গে কি রকম কবে কথা বলতে হয় তুই জানিস্‌নে?

এই দিন সাতেক আগেও সে সেবাকার্য্যে যাচ্ছে শুনে ক্লাসের তনিমা সান্তাল জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, বাজ্জারামবাবু, মেয়েরা ওখানে গিয়ে কি সেবার ভার নিতে পারে না?

বাজ্জারাম একবার ওর বেশ-ভূষার দিকে দৃষ্টিপাত করে জবাব দিয়েছিল, পারে। কিন্তু সাড়ি আর লিপষ্টিকের বাহার নিয়ে দিনেমাতেই মানায় ভালো।

তনিমার ‘অ্যাড্‌মায়ারারের’ দল তখনি ঘুঁষি উঁচিয়ে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এসেছিল

কিন্তু তিনিমাই নাকি শেষ পর্য্যন্ত এই জাতীয় একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটতে দেয়নি।

ছেলের দল তাতে বিশেষ মনঃক্লগ্ন হয়েছে।

ভাগ্যিস, মনের কথা মুখে লেখা থাকে না।

সেই ছেলের দল আজ যদি জানতে পারে যে, একটি চাষার মেয়ে বাজারামের মনকে টেনেছে, তা হলে কলেজ-ম্যাগাজিনে বেনামীতে কবিতা আর কাঁটুন যে বেরুবে না সেই কথাই বা কে বলতে পারে?

তারপর সারাদিনের কাজের ঘূর্ণি হাওয়ায় বাজারাম মেয়েটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

সকাল বেলা লাইন দেয়া লোকদের রেশন-কার্ড ব্যবস্থা করবার সময় হঠাৎ মনে হল কুপার্স ক্যাম্পে গিয়ে টেপীর একবার খবর নেয়া প্রয়োজন।

নিজের দায়িত্বটা অন্য একজন স্বেচ্ছাসেবককে বুঝিয়ে দিয়ে বাজারাম স্টেশন ছেড়ে রাস্তার দিকে রওনা হল। সেই সময় “মারোয়ারী বিলিফ সোসাইটির” একটি ট্রাক শিবিরের দিকে যাচ্ছিল। ওদের ডাইভার আর ভলান্টিয়ার বাজারামের পরিচিত। তারা ওকে ডেকে ট্রাকের ওপর তুলে নিলে।

ক্যাম্পে পৌঁছে হাজার হাজার উদ্ভাস্তর মধ্যে বাজারাম আর টেপীকে খুঁজে পায় না। মেয়েটা রাস্তার মধ্যে একেবারে কর্ণুরের মতো উপে গেল নাকি!

অনেক ছোটোছুটির পর দেখা গেল—ক্যাম্প ছেড়ে একটা গাছতলায় টেপী পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। বাজারাম ওকে গতকাল

রেশন-কুপন জোগাড় কবে দিয়ে গিয়েছিল। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, হাঁরে টেঁপী, তুই রান্না করবি নে? চাল-ডাল কোথায়?

টেঁপী একবার মুখ তুলে ওকে দেখে বলে, চাইল-ডাইল রাস্তায় ছড়াইয়া ফেইল্যা দিছি। বাজারাম ভাবলে, আচ্ছা পাগলি মেয়ে ত! তবু শুধোলে, চাল ডাল ফেলে দিলি, খাবি কি? টেঁপী বলে, খামু আমি আখার ছাই!

এত দুঃখেও বাজারাম হেসে ফেলে।

বলে, কিন্তু উম্মনের ছাই খেলে ত আর পেট ভরবে না! টেঁপীর চোখে আবার জল দেখা গেল। মাথা নীচু করে বলে, পঁরাণ আমার বাইর হইয়া যাউক। এমন পঁরাণ থাইক্লেই বা কি, গ্যাংলেই বা কি!

কি তোর মনের ব্যথা আমায় খুলে বল ত' টেঁপী। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যদি কিছু করতে পারি। ধীরে ধীরে বাজারাম বলে। ঠিক যেন অনেকটা বাসর ঘরের প্রেম-গুঞ্জনের মতো।

টেঁপী ফোঁস করে উঠে বসল, বাইরের গোটা কয়েক পেটমোটা মুখপোড়া—তোমাগো হাওয়া গাড়ী চইর্যা আইছিল। মিঠা মিঠা কথা কয়। গা গয়নায় ভইর্যা দিবো, কোন্ বাগান-বাড়ীতে নিয়া রাইখবো—পায়ের উপর পা থুইয়া খামু—দাসী গা টিপ্যা দিবো... আরো কত কথা... মুয়ে আগুন মুখ-পোড়াগো। আমাগো এই দুঃসময়, আর ওরা আইসে কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিবার লাইগ্যা।

কথাটা বাজারাম একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না। একদল বজ্জাত লোক এই উদ্দেশ্যে গভীর রাতে শিবিরের আশে-পাশে ঘোরে—একথা আরো ছ একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে কয়েকদিন আগে বলছিল...কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু আজ টেপীর মুখের কথা শুনে আর তার চোখে জল দেখে সে বুঝলে যে ব্যাপারটা মিথ্যে নয়।

তা হলে ত টেপীকে কোথায়ও সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টেপী ধমক দিয়ে ওঠে, কি গো ভালো মাইন্সের পোলা, মুখে বোবা-কাঠি ছোঁয়াইলা নাকি? ভাইব্লা, পরের ম্যায়ার ঝক্কি খামাখা কে ঘাড়ে নেয়? তার যদি না নিবা ত খাজুইর্যা আলাপ কইরবার আইছিল। ক্যান্?

সত্যি কথাই ত।

ভারই যদি না নেবে তবে বাজারাম মিছিমিছি টেপীর খোঁজ নিতে এসেছ কেন? শুধু স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব থেকে কি?

না—না, এই সরল গ্রাম্য মেয়েটাকে সহবের কামনার পঙ্কিল স্রোতে ভেসে যেতে দেয়া হবে না। যে ক'রেই হোক বাজারাম তাকে বাঁচাবে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বাজারাম বললে, দেখ্ টেপী, এই রাণাঘাটেই আমার এক দিদি আছে। চল, তোকে সেইখানেই রেখে আসি।

টেপী এক গাল হেসে ফেলে জবাব দিলে, তোমার দিদি? তাইলে ত' ভালই হয়। অ্যাথুনি আমারে নিয়া চল সেহানে। আমি দিদির পা জড়াইয়া ধইর্যা থাকুম।

বাঞ্ছারাম তখন বললে, তা হলে ত' ক্যাম্পের কর্তার অনুমতি নিতে হবে।

আঁচলে গাছ-কোমর বেঁধে টেপী হুংকার দিয়ে উঠল, কার আবার মত ন্যাওন লাইগুবো শুনি? ভাত-কাপড়ের কেউ না, নাক কাটনের গোসাঁই! হুঁ...চল-চল—

কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে তড় বড় করে টেপী উঠে দাঁড়ালো।

দিদি মুখে কিছু বললে না বটে, আইবুড়ো ভাইয়ের সঙ্গে এক সোমত্ত মেয়ে দেখে খুসী হতে পারল না।

বাঞ্ছারাম বললে, আহা, গেরস্ত ঘরের মেয়ে—বড় বিপদে পড়েছে। দিন কয়েক তোমায় কাছে থাক—তারপর আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেবো। এর পর থেকে বাঞ্ছারাম ছুবেলা এসে টেপীর খোঁজ নিয়ে যায় এটাও দিদি বিশেষ শ্রুণু করে দেখেনি।

এই ভাইকে বিয়ে দেবার জন্তে আত্মীয়-স্বজন কত ঝুলোঝুলি, বন্ধু-বান্ধবদের কত বোঝানোর পালা। কিন্তু কেউ বাঞ্ছারামকে রাজি করাতে পারে নি।

সে যখন সবাইকার কথা অগ্রাহ্য করে সেবাকার্য্যে মেতে উঠলো তখন ভাইবোনের দল মনে করল, বাঞ্ছারাম বুঝি সত্যিই সন্ন্যাসী হবার জন্তে মনস্থ করেছে।

কিন্তু এখন একটি চাষার মেয়ের জন্ত অহেতুক দরদ দেখে দিদিব বাড়ীর সবাই নাসিকা-কুঞ্জন করতে শুরু করল।

সেদিন বাঞ্ছারামের দিদির বাড়ীর ঝি পালিয়ে গেল। বাড়ীতে কচি ছেলে, কাঁথা কাচবার কেউ নেই। দিদি ডেকে বললে, টেপী,

এই কাঁথাগুলিতে সাবান দিয়ে একেবারে স্নান করে এসো। টেঁপী এখানে এসে খুসী মনেই ছিল। সে গুণ-গুণ করে কেতন গাইতে গাইতে কাঁথায় সাবান মাখাতে বসল।

এমন সময় বাজারাম এসে উপস্থিত। টেঁপীকে ময়লা কাঁথা কাচতে দেখে সে মনে মনে ভারী চটে গেল। তারপর দিদিকে ডেকে বলল, দিদি, তুমি টেঁপীকে দিয়ে এই সব নোংরা কাজ করাচ্ছ কেন?

দিদি একটু অবাক হয়ে শুধোলে, কেন রে, তাতে কি হয়েছে? গেরস্ত ঘরের মেয়ে...আমার এখানে আছে। কচি ছেলের জন্তে একটু কাজ করলে ত আর হাত ক্ষয়ে যাবে না!

বাজারাম খানিকটা গুম হয়ে রইল। তারপর ফস্ করে বলে ফেলল, ও যে তোমার ভাই-বোঁ হবে। ওকে একটু যত্ন-আত্তি না করলে চলবে কেন?

ওর দিদি নিজের মৃত্যুর কথা শুন্লেও বুঝি এমন করে আঁংকে উঠত না! বলল, তুই বলিস্ কিরে বাজা, শেষকালে চাষার মেয়েটাকে বিয়ে করবি? জাত-কুলের কিছু ঠিক আছে ওর ভেবেছিস? জ্যাঠামশাই শুন্লে কি বলবেন?

বাজারামেরও মেজাজের ঠিক ছিল না। সে-ও গরম গরম জবাব দিলে, কেন? টেঁপী এমন কি খারাপ মেয়ে শুনি? ও পাউডার মাখে না, লিপষ্টিক্ ঘষে না, আয়নায় সাতবার করে মুখ দেখে না, ব্লাউজ পরে না, তাই সে খারাপ হয়ে গেল? ওর স্বাস্থ্যটা দেখেছিস? তাদের চারজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। বদহজম আর ডিস্পেপ্সিয়ায় ভোগে না! আর আজকের দিনে

আমি কোন জাত মানিনে। আমাদের কাছে সব মানুষই সমান—।
জানিস্ ত কবি চণ্ডীদাস বলে গেছেন—“সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।”

দিদি এই বিরাট বক্তৃতা শুনে আর কোন জবাব দিলে না,
শুধু টেঁপীর হাত থেকে কাঁথা আর সাবান কেড়ে নিয়ে ওকে ওপরে
পাঠিয়ে দিলে।

কিন্তু সেই দিন থেকে ও বাড়ীতে টেঁপীর নতুন নামকরণ হল—
‘রামী’, আর বাঞ্চারামের নাম হল ‘চণ্ডীদাস’।

বাঞ্চারাম বাড়ীতে এলেই মেয়েরা গিয়ে টেঁপীকে ঘিরে ধরে
বলত, ভাই রামী, তোর চণ্ডীঠাকুর এসেছে—এই সময়ে একটি
কেতুন শুনিয়ে দে না ভাই—

টেঁপীর কিন্তু এসব রসিকতা ভালই লাগত, সে শুধু মুখ টিপে-
টিপে হাসত—একটুও রাগ করত না।

এদিকে সে বাঞ্চারামকে ধরে বসল, এখানে থাকন আর ভাল
দেখায় না, তুমি একটি ঘর ঠিক কইরা আমায় সেইখানে নিয়া
যাও। আমি একদিনে গেরস্থালি গুছাইয়া নিমু।

বাঞ্চারাম খুসী হয়ে জবাব দিলে, সেই ভালো, আমি
কল্‌কাতায় ঘর ঠিক করে তোমায় সেইখানে নিয়ে যাবো। তার
আগে দিদির এখানেই বিয়েটা সেরে নিতে হবে। নইলে লোকে
বলবে কি ?

দিদি শুনে বল্লে, মুখে আগুন। আমি বিয়ের কোন ব্যবস্থা
করতে পারব না। আমার বাড়ীতে এসব কেলেঙ্কারী হলে
জ্যাঠামশাই জীবনে আমার আর মুখ দর্শন করবেন না।

বাঞ্ছারামের ভগ্নীপতি রসিকতা করে বল্লে, আহা ! তোমায়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে কেন ? আমার রসিক শ্যালকটিকে বলো,—সোজা শ্রীনবদ্বীপধামে চলে যেতে, সেখানে কণ্ঠীবদল করলে নবযুগের চণ্ডীদাস আর রামীর নাম খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। চাই কি একটা যুগল-মিলনের ছবি পর্যন্ত বেরুতে পারে।

বাঞ্ছারামের দিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বল্লে, তুমি আর জ্বালিওনা বাপু। বাসা করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে—তা নিয়ে যাক্ না ; মেয়েটা গেলে আমি গঙ্গা-স্নান করে বাঁচি !

ভগ্নীপতি মশাই কিন্তু থামলেন না, বরং আরও উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, তুমি চট্‌ছ বটে গিনি, কিন্তু কল্‌কাতার কবিরা খবর পেলে এই শুভানুষ্ঠানের দীর্ঘ-প্রশস্তি রচনা করবেন। চাই কি, কোনো কোনো কাগজের একটি বিশেষ সংখ্যাও বেরিয়ে যেতে পারে।

বাঞ্ছারামের দিদি এই কথাগুলির প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে চাইল না, চোখ-মুখ লাল করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছনে বাঞ্ছারামের ভগ্নীপতির হেঁড়ে গলার কেতন শোনা গেল—

“শুন রজকিনী রামী—

ও ঢুটি চরণ শীতল বলিয়া শরণ লইলু আমি।”

তার পর সেকি হো-হো হাসি !

বাড়ীর গৃহিণীর কানে সে হাসি যেন বিষ ঢেলে দিল ! নিজের ভাই—কহিতেও পারে না, সহিতেও পারে না। এ যেন শাঁখের

করাত—যেতে কাটে, আস্তে কাটে ! সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বাঞ্ছারাম এলো টেপীর খবর নিতে।

ভগ্নীপতি চোখ টিপে বললে, ভায়ার উদ্বাস্ত-শিবির কি আজকাল আমার ঘরে এসে পৌঁছেছে ? আগে যে টিকিটি দেখবার যো ছিল না। এখন ছ’বেলা দিদির খোজ-খবর নেয়া হচ্ছে ! আহা ! এমন ভাই থাকলে বনে গিয়েও সুখ !

বাঞ্ছারামের মন-মেজাজ ভাল ছিল না। কেননা, সে এখনো কল্‌কাতায় একটি ঘর সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই বললে, ঘর ভাড়া পাচ্ছি না বলেই তোমাদের এত কথা শুনতে হচ্ছে জামাইবাবু। কোন মতে একটি জোগাড় করতে পারলে আমরা তোমাদের কথা শুনতে আস্‌ব না।

ভগ্নীপতি বালিশ বাজিয়ে বললে, তা’ আস্‌বে কেন ? মধুর ভাণ্ড সরে গেলে কি মৌমাছি আর ফিরে আসে ? তুমিও যে সেই দলের সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তা ভায়া, আজকাল সেবাকার্য্য ছেড়ে কি কবিতা রচনা শুরু করেছ ? আমরা মানে—এই পাপীর দল কি ছ’ একটা পয়ার শুনতে পাইনে ?

বাঞ্ছারাম কথার কোন জবাব না দিয়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। সেখানে নীচের অন্ধকার কোনটিতে টেপী তার জন্ত অপেক্ষা করছিল। কোন রকম ভূমিকা না ক’রেই টেপী তাকে আক্রমণ করল, কুটুম-বাড়ী আর কয় দিন থাকুম কও দেহি তুমি ? একখান ঘর মিললো না কৈলকত্তা সহরে, এই কথা বুঝাইবার চাও আমারে ? যদি এহান থনে আমারে লইয়া না যাও ত আমি গলায় দড়ি দিমু—

টেপীর ছ গাল বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। বাজারাম অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে মনে মনে তারিফ করে বলে, Splendid ! তার এক শিল্পী বন্ধু যদি এই দৃশ্য দেখত ত ব্রাহ্মের টানে চমৎকার ছবি এঁকে নিতে পারত। মোনালিসার হাসি আর টেপীর চোখের জল একই পর্যায়ের ক্লাসিক হয়ে থাকত ! আগে ঘরটা ভাড়া করে নিক। তারপর নিজের কোন সাধই অপূর্ণ রাখবে না !

বাজারামকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে টেপী যেন একেবারে জ্বলে উঠল। বলে, ব্যাটা-ছাওয়াল না তুমি ? নিজের পরিবারের ঠাই কইর্যা দিবার পার না, রাজ্যি শুদ্ধু মানুষের উপকার কইর্যা ব্যাড়াও ? কেমন মানুষ তুমি ? আইজই তুমি আমারে এহান খনে লইয়া যাও—

বাজারাম তাকে বুঝিয়ে বলে, তুমি রাগ কোরো না টেপী, আসছে কাল আমি বাসা ঠিক করে ঠিক তোমায় নিয়ে যাবো। এতে আর নড় চড় হবে না।

টেপী বলে, আমার গা ছুইয়া কও—না অইলে তোমার কথায় বিশ্বাস কি ?

বাজারামকে প্রতিজ্ঞা করতে হল।

ওপরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ী শুদ্ধু লোক চণ্ডীদাস আর রামীর প্রেমালাপ শুনছিল, বাড়ীর কর্তা আবেগে গান গেয়ে উঠলো—

“তোমারি চরণে

আমারি পরাণে

লাগিল প্রেমের ফাঁসি—”

বাঞ্ছারাম ওপরের দিকে তাকিয়ে চোখের একমুঠি জ্বলন্ত আগুন সকলের মুখে ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত পদে চলে গেল।

বাড়ীতে বাঞ্ছারামের দিদির ছিল এক দল ননদ। তাদের বেরসিক বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। তারা সবাই মিলে সকাল থেকে টেংগীকে নিয়ে মেতে উঠল।

নতুন শ্বশুর-ঘর করতে যাচ্ছে—কনেকে মনের মত সাজিয়ে দিতে হবে ত!

এলো পাউডার, স্নো, লিপস্টিক, কাজল, বেলফুলের গোড়ে—
আরো কত কি—

ওদিকে স্বপ্ন দেখছে বাঞ্ছারাম—

একটী ঘরের খবর পাওয়া গেছে শিয়ালদা' অঞ্চলে।

টেংগী আসছে ওর ঘরগী হতে।

ও যে লজ্জা না করে তাকে ধমক দিয়ে ঘরের জন্তে তাগিদ দেয় তাতে বাঞ্ছারাম ওর নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার পরিচয় পায়।

এরাই ত' সত্যিকারের বীরাজ্ঞা। ভবিষ্যতে এই টেংগীর দলই দেশে বীর-প্রসবিনী হবে।

বাঞ্ছারামের আদর্শ যেন তার জীবনে মূর্ত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে আসছে।

ননদের দল কিছুতেই ছাড়েনি...বৌদির একটি পুরোনো বেনারসী শাড়ী যোগাড় করে কনেকে সত্যি মনোমত করে সাজিয়েছে।
কপালে চন্দন-তিলক জ্বল-জ্বল করছে।

পাড়া থেকে অনেকগুলি শাঁখও চেয়ে নিয়ে এসেছে।
বাঞ্ছারামের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় মঙ্গল-ধ্বনি তুলতে হবে।

সবই তৈরী...শুধু পাত্রেরই দেখা নাই...

এত দেরী কেন করছে বাঞ্ছারাম? ননদের দল একেবারে
অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

এমন সময় গলির মোড়ে হস্তদস্ত হয়ে বরকে আসতে দেখা
গেল।

সবগুলি শাঁখ একসঙ্গে বেজে উঠে গোটা পাড়াকে সচকিত
করে তুলল।

বাঞ্ছারাম ভেতরে
চুকে টেপীর কনে-
সাজ দেখে অবাক
হয়ে বসে, এ কি
কাণ্ড?

ঘাড় হেঁট করে
সলজ্জ ভঙ্গীতে টেপী
জবাব দিল, দিদিমণিরা
সব আমাদের বিয়ার
কনে সাজাইয়া দিল
...আমি কি আর
না কইরবার পারি?

টেপী টিপি-টিপি হাসতে থাকে।

কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বাঞ্ছারাম।



বল্লে, হ' ! কনে সেজে ত বসে আছ, ওদিকে হাতে-পাওয়া
ঘর হাত-ছাড়া হয়ে গেল !

টেংপীর মুখখানা দেখে মনে হ'ল—সে যেন অথৈ জলে
তলিয়ে যাচ্ছে ।

ভয়ে ভয়ে শুধোলে 'ক্যান্—কি অইল আবার ?'

বাঞ্ছারাম হাত-মুখ নেড়ে জবাব দিলে, অনেক কষ্টে একখানি ঘর
জোগাড় করেছিলাম । আগে মুসলমান ভাড়াটে ছিল । কিছু
টাকা আগাম-দক্ষিণাও জমা দিয়েছি । সকালে গিয়ে খাট পেতেছি ।
হু'পুর বেলা পুলিশের লোক নিয়ে এলো সেই আগেকার মুসলমান
ভাড়াটে । নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির সর্ত অনুসারে ঘর ছেড়ে দিতে
হল ! আমরা হচ্ছি সমাজসেবী, চুক্তিভঙ্গ ত' আর করতে
পারিনে !

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে বাঞ্ছারাম কপালের ঘাম মুছতে
লাগলো ।

ইঠাৎ দেখা গেল কনে লাফিয়ে উঠে ফটকেব দিকে ছুটেছে...
তারপর একেবারে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে ছুটেতে
আরম্ভ করল ।

রসিক ভগ্নীপতি বল্লে, রামী কি এবার বাগুলি মন্দিরের উদ্দেশ্যে
ছুটল নাকি ?

ননদদের মুখ থেকে শাঁখগুলি পড়ে গেল ! বাঞ্ছারাম প্রথমটা
কিছু ব্যস্তে পারেনি । তারপর যখন দেখল, টেংপী সত্যি পথ
দিয়ে পাগলের মতো ছুটেছে—তখন সেও পেছন পেছন ধাওয়া
করল ।

ভগ্নীপতি পেছেন হাততালি দিয়ে বল্লে, এইবার চণ্ডী ঠাকুর আর রামীর পালাটা জম্বে ভাল—। হায় হায় এমন সময় খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টারও নেই।

ছুটতে ছুটতে হু'জনে ষ্টেশনে এসে হাজির।

বাঞ্ছারাম শুধোলে, এ কি টে'পী, পাগলের মতো তুমি চলে কোথায় ?

টে'পীর চোখে জল ! জবাব দিলে, দিদিমণিগো বড়-গলা কইর্যা কইচি আইজ আমি রওনা দিমু। তা তুমি ভালো মাইন্যের পোলা যখন ঘরই পাও না—তখন আমি চইল্লাম।

অবাক হয়ে বাঞ্ছারাম ভিক্সেস করে, কোথায় তুমি চলে ?

টে'পী কয়, পাকিস্তানে। সেখানে মুখপোড়া ছায়েদ আলী আমার গয়নার বাক্স লইয়া আমার পথ চাইয়া বইস্থা আছে।—

বাঞ্ছারাম চীৎকার করে ওঠে, সে কি ! তুমি মুসলমানের কাছে ফিরে যাবে ?

টে'পী কঁাদতে কঁাদতে বল্লে, কান যামু না শুনি ? তুমি ভালো মাইন্যের পোলা...একখান্ ঘর জোগাড় কইরবার মূরদ তোমার নাই। আক বেলা ভাত দিবার সামর্থ্য নাই তোমার। কিসের লাইগ্যা তোমার ঘর করুম ? ওহানে ছায়েদের তিরিশ বিঘা ধানি জমি, গাই-বলদ, খাতের কলুই, পুঙ্কির মাছ...গোলাভরা ধান। না হয় তার আর তিনডা বিবিই আছে। সে আমার লাইগ্যা পাগল ! আমার গয়না যে কইর্যা রাখ্ছে আমি তার কাছেই যামু...

পাকিস্তানগামী একটি ট্রেন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। টেপী
উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে একখানা কাম্রায় গিয়ে উঠল।

পাকিস্তানের পক্ষশরের নাম কি বাজারামের জানা নেই।
নইলে সে তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসত।

কিন্তু কিছুই করা হল না।

কাজেই ফ্যাল-ফ্যাল করে চলন্ত ট্রেনের দিকে সমাজ-হিতৈষী
বাজারাম অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল !



রামধনুকের সাতটা রঙ মেশানো একটা মধুর-স্বপ্ন শৈলীর মনে-
প্রাণে বাসা বেঁধেছিল যে, বাসরঘরে তাব বর কৌ দিয়ে প্রথম কথা
শুরু করে !

কিন্তু শৈলীকে সকল রকমে হতাশ ক'রে দিয়ে ভূপেশ যে কথার
অবতারণা করল, নতুন কনে তার জগ্নে আদপেই প্রস্তুত ছিল না ।

আর সত্যি কথাই ত !

একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়, চাঁদের আলো, পাখীর গান,
নদীর তান নয়, এমন কি সুন্দর একটি ফুলের নাম পর্যন্ত নয়...

একেবারে ছন্দ-পতনের মতো ভূপেশ বেমকাতাবে জিজ্ঞেস ক'রে
বসল : পিপড়ের পেট টিপে সংসার চালাতে পারবে ? বাজার বড়ো
ঝারাপ। যে কোনো দিন চাকরি চলে যেতে পারে...কাজেই
তোমায় আগে থেকেই হুঁসিয়ার ক'রে দিচ্ছি।

শৈলী একেবারে থ মেরে গেল !

তবু মনে আশা...প্রথম কবিতা লিখতে গেলে ছন্দ-পতন হওয়া
স্বাভাবিক। নবীন-কবি নিজেব ভুল বুঝতে পেরে যদি কোনো
রকমে ছন্দ আর মিলটা ঠিক ক'রে নেয়।

কিন্তু বুথা আশা !

ভূপেশ আবার মন্তব্য প্রকাশ করল, সারাদিন উপোস করেছিলে,
তোমার শরীর বোধ করি খুবই ক্লান্ত। মিছিমিছি বাজে কথা ব'লে
তোমায় জাগিয়ে রাখবো না। আজ ঘুমিয়ে পড়ো।

যারা আড়ি পাততে এসেছিল তারা সবাই এই “অমৃত সমান
মহাভারতের কথা” শুনে যে মার মতো সরে পড়ল।

শৈলীর দোহে-মনে সুগন্ধ...কপালে চন্দনের মধুর প্রলেপ।
মনে হ'ল সেই চন্দন-লেখাগুলি বিছে হ'য়ে যেন তার সারা দেহে
কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে !

গলায় যে সাদা বজনীগন্ধাব মালাটা ছল্ছিল রাগ ক'রে পাশ
ফিরে শুতে গিয়ে সেটা গেল ছিঁড়ে। শৈলীর বুকে তখন যেন
সাতটা ঢেঁকীর পাড় শুরু হয়েছে।

কিন্তু কাল সকালে সন্ধ্যের দল যখন তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস করবে

—কি প্রেমালাপ প্রথম রজনীতে হ’ল—ও তো কোনো জবাবই দিতে পারবে না !

গীতা, শ্যামলী, ছায়া, কমলা, ইন্দু...ওদের কাছ থেকে বিয়ের কনের প্রথম রাত্রে যে ইতিহাস সে সংগ্রহ করেছিল তাতে বিনা খরচায় বেমালুম একটি তাজমহল গড়ে আপনার মনে তাকে লালন-পালন করছিল।

কিন্তু এখন দেখতে পেল যে, আকাশ-কুশুম্বে আর যাই তৈরি হোক—তাজমহল নির্মাণ করা সহজ নয়। শাজাহান কবি হ’তে পারেন, শিল্পী হ’তে পারেন আর প্রেমিকও হয়ত ছিলেন। তাই বলে তাঁর পকেট ভূপেশের মতো গড়ের মাঠ নিশ্চয়ই ছিল না।

সে ছুঁৰ্ভাগ্য যদি সম্রাট-কবির হ’ত তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাকে নিয়ে কবিতা রচনা করবার ফুরসৎ পেতেন কিনা সন্দেহ !

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস শৈলীর বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল কিন্তু বহু কষ্টে ঢোক গিলে সেটাকে বৃকের তলায় পৌঁছে দিলে। তাব নিঃশ্বাসের সামান্যতম শব্দও ভূপেশের কানে গিয়ে পৌঁছুক এটা শৈলী এখন একেবারেই চায় না।

পাশ ফিরে সে যে দিকটায় শুয়েছিল সেখানে রয়েছে খণ্ডিত একটি বাতায়ন এবং সেই বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক-ফালি চাঁদ। টুকরো-টুকরো মেঘ সেই চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। চাঁদের সঙ্গে মেঘের এই লুকোচুরির কোনো অর্থ হয় ? নালাকাশে আলু, পটল, বেগুন আর লঙ্কার সেরের হিসেব কেন লেখা নেই ?

স্বয়ং বিধাতা বোধ করি হিসেব ভুলে গেছে।

দু'বছর পরের কথা ।

যে ভূপেশ জীবনে কখনও ছুটি চায়নি আজ তার মুখে ছুটির কথা শুনে স্বয়ং অফিসের বড়বাবুও যেন কেমন হকচকিয়ে গেলেন ।

কিন্তু ছুটি আজ ভূপেশের চাই-ই ।

বিয়ে হবার পর থেকে আজ দু'বছরের মধ্যে শৈলীকে নিয়ে একদিনের জন্যও সে কোনো সাধ-আহ্লাদ করেনি । সম্প্রতি সে খবর পেয়েছে তার প্রমোশন হয়েছে । মোটা টাকা মাইনে বেড়েছে । এদিন যে মাইনে কম করে ব'লে পোষ্টাফিসে টাকা জমিয়ে এসেছে সেকথা শৈলীকে ঘৃণাক্ষরেও জানতে দেয়নি ।

শৈলী সংসার খরচের জন্যে টাকা চাইলেও সে দাঁত-মুখ থি'চিয়ে উঠেছে । সঞ্চয়ের পরামর্শ দিয়েছে এবং বাজে খরচে যে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয় ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত ক'রে সে কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ।

নাঃ ! আর লুকোচুরি নয় ।

এইবার সোজাসুজি গিয়ে সত্যিকারের মাইনের পরিমাণটাই শৈলীকে সে জানিয়ে দেবে ।

বড়বাবুর চমকিত ভাবটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছুটিটা আদায় ক'রে নিয়ে দু'তিনটে ক'রে সিঁড়ি টপ্কে সে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ।

যাক—শৈলীকে আজ সে নিতান্তই অবাক ক'রে দিতে পারবে ।

দু'গাছা রক্তনীগন্ধার মালা বোবাজারের মোড় থেকে কিনে

নিলে। কথায় কথায় শৈলীর এক সখীর কাছ থেকে সে জানতে পেরেছিল যে, শৈলী ডালমুট আর চকোলেট পেলে দুনিয়ায় আর কিচ্ছু চায় না। কিন্তু পয়সা খরচ হবার ভয়ে ইচ্ছে ক’রেই সে পথে কখনো পা বাড়ায়নি।

আজ যেন ভূপেশ হিসাবহীন...লক্ষ্মীছাড়া হ’য়ে উঠল।

পকেট ভর্তি ডালমুট, চকোলেট, রজনীগন্ধার মালা, একটি দামী শাড়ি আর সিনেমার ছ’টি টিকেট কিনে সে যেন একেবারে উড়তে উড়তে বাড়ী ফিরে এলো।

মহাভারতে ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যে জবাব দিয়েছিল মনে সব চাইতে দ্রুতগামী

...আজ যেন ভূপেশ
সেই কথা সমাক
উপলব্ধি করতে
পারল।

কিন্তু এ কি! সদর
দরজা খোলা!

না—না—এরকম
ভুলত শৈলীর কখনো
হয় না! তার সংসা-
রের সুখ-সুবিধের
দিকে শৈলীর প্রথর
দৃষ্টি। নিজে না খেয়ে

সে স্বামীর জন্ত টাকা বাঁচাতে এখন বেশ শিখেছে।



তবে কি ঠিকে-ঝিটা ভুল ক'রে সদর দরজা খুলে রেখে অশ্রুমনস্ক-
ভাবে বেরিয়ে গেছে ?

তাই বা কি ক'রে হবে ? শৈলার চতুর্দিকে প্রথম দৃষ্টি । স্বামীর
যাতে ক্ষতি হয় এমন কাজ সে জীবনে করবে না । ছ'বছর ধরে
সেই শিক্ষাই ত' ভূপেশ তাকে দিয়েছে ।

তবু তবু করে সে দোতলার ঘরে উঠে গেল ।

তাই ত' ! বাড়িতে কেউ নেই দেখছি !

ভূপেশ বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকায় !

একটি চিঠি টেবিলের ওপর চাপা দেয়া আছে । ভূপেশ সেই
দিকে এগিয়ে যায় :

চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত—

“তোমার সংসারের সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি
এতদিন খরচ করেছি । আজও সেট জুগাই চলে যাচ্ছি । অমৃতঃ
একটা প্রাণীকে আর খোরাক-পোষাক দিতে হবে না । সেই টাকাটা
মাসে মাসে পোষ্টা পিসে জমা দিও...আগেরে কাজ দেবে ।

আমার আর কোনো খোঁজ ক'রে সময় নষ্ট করো না । তোমার
মাতানে বেড়েছে, আমিও খরচ বাঁচিয়ে গেলাম...এবাব থেকে আরো
জমাতে পারবে ।”



খাতনামা রসশ্রষ্টা সৌখীন খাসনবীশের বাজারে বেশ নামডাক আছে। পূজোর বাজারে হাসির গল্প লেখায় তাঁর নাকি জুড়ি পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক কাগজ থেকেই ফরমাস আসে, এমন একটি হাসির গল্প লিখতে হবে যা' পড়ে পাঠক-পাঠিকার পেটে-পিঠে খিল ধরে যায়!

বাছা-বাছা চোখা-চোখা কথা সাজিয়ে খাসনবীশ মশাই পূজোর বাজার মাং করেন। সৌখীনের কথাগুলি যেন শান্ দেয়া বাণ। পাঠক-পাঠিকার মনে লাগা মাত্র একেবারে Laughing gas অনর্গল বেরিয়ে আসতে থাকে।

যার লেখায় এত হাসির খোরাক মেলে, সেই সৌখীনবাবু মানুষটি নাকি অতি কাঠখোঁট্টা—লোকে এইরকমই কাণাঘুষা করে থাকে। সৌখীনবাবুর পাড়ায় যারা বাস করে না তাদের হা-ছত্যাশের আর অন্ত নেই! তারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, হায়, যদি ওই মানুষটির আশে-পাশে থাকতে পারতাম তবে বাজারে যাবার পথে, ট্রামে ওঠবার মুখে, সিনেমায় যাবার যোগে নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত! হাসি-তামাসার কথাও কি ছু' একটা না হত!

সহরের সেরা ডাক্তাররা বিমর্ষ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক সময় সৌখীন খাসনবীশের এই পড়বার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন! তাঁর লেখা “আশু'লার অফালন,” “কুয়াণ্ডের কচ্‌কি,” “কুমারিকা থেকে কামস্‌কাটকা,” “সিনেমা-ষ্টারের শরশয্যা” প্রভৃতি বই পড়েননি এবং পড়ে হাসতে হাসতে সারা গায়ে বাথা ক'রে অফিস কামাই করেন নি এমন ব্যক্তি এ যুগে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ!

সুতরাং সেই সৌখীন খাসনবীশের চাহিদা যে পূজোর বাজারে বেড়ে যাবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এই লেখকের গল্প নিয়ে নাকি ব্র্যাক-মার্কেটও চলে!

অনেকগুলো গল্প খাসনবীশ মশাই লিখে ফেলেছেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার সংখ্যা অতি নগণ্য। Q-এর পাশে যেমন

সদা সর্বদা U বিরাজ করে থাকে, তেমনি পূজো সংখ্যা প্রকাশ করতে গেলে সৌখীন খাসনবীশের গল্প একেবারে অপরিহার্য্য।

সারা বছর ধরে খাসনবীশমশাই ছোট একটি খাতায় প্লট সংগ্রহ ক'রে থাকেন এবং পূজোর বাজারে অতি চড়া দরে সেইগুলি যথারীতি ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে, রং মিশিয়ে ছেড়ে দেন। অতি মুখরোচক বলে সম্পাদকবৃন্দ সেই রচনাগুলি লুফে নিয়ে থাকেন।

এমন ঘটনাও বহু কাগজে ঘটেছে যে, শেষ মুহূর্তে পাণ্ডয়ার দরুণ বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে সম্পাদক মশাই সৌখীন খাসনবীশের গল্প প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

এ বছর বাড়তি যত প্লট ছিল সবগুলিকে কাজে লাগিয়ে খাসনবীশমশাই বুড়ি ঝেড়ে অকুপণ ভাবে সবাইকে বিলি ক'রে ভাবছিলেন এইবার নিশ্চিন্ত। পূজোর বাজারে আর ফাউন্টেনপেনে কালি ভরতে হবে না!

কিন্তু 'মরিয়া না মরে রাম!' শেষ মুহূর্তে অনুরোধ এলো 'রসালো' কাগজ থেকে। সম্পাদকের একান্ত অনুরোধ, পূজো সংখ্যায় একটি রসসৃষ্টি করতেই হবে। নইলে পাঠক-পাঠিকাগণ নাকি মারমুখো হয়ে 'রসালো' কার্যালয় আক্রমণ করবে—এই রকম নোটিশ পাঠিয়েছে!

গত বছর সৌখীন খাসনবীশের গল্প ছাড়া পূজো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বলে 'রসালো' স্তূপীকৃত হয়ে আফিসে পড়ে আছে, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি! তাই সম্পাদকের সাম্মান্য অনুরোধ যে, বিলম্বে হলেও তাঁর এই একান্ত মিনতি রাখতেই হবে, নইলে চাকরী রাখাই মুশ্কিল হয়ে উঠবে।

সৌখীন খাসনবীশ বিপদে পড়লো। সত্যি ত' কাউকে তার রসসৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না ! তার লেখা না পেয়ে যদি একটি কাগজ পটল-উত্তোলন করে তবে সেটা গর্বের কথা হতে পারে, কিন্তু বেঁচে থাকতে এই লজ্জাজনক ঘটনা সে ঘটতে দেবে কেন ? কাজেই সৌখীন খাসনবীশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে, গল্প লেখার জন্য লেখক যখন উৎসাহিত হয়ে ওঠে, বাড়ীর লোক তখন শঙ্কিত হয়ে দুর্গানাম জপ করতে থাকে !

ছোট ভাই চুপি চুপি বৌদিকে গিয়ে খবর দিলে, বৌদি, সর্বনাশ, দাদা আবার আজ বিকেলবেলা কলমে কালি ভরে নিলে !

বৌদি চোখ দুটি বিষ্ফারিত ক'রে জবাব দিলে, বল কি ঠাকুরপো, এই যে শুনলাম এ বছর পূজোর লেখা শেষ হয়ে গেল !

আমিও ত' তাই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কিন্তু সকালের ডাকে 'রসালো' কাগজ থেকে যখন একখানি খামের চিঠি এলো তখনই আমার বাঁ-চোখটা নেচেছিল। ভয়ে ভয়ে ছোট ভাই রঙীন জবাব দিলে।

বৌদি খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, 'রসালো' কাগজের চিঠিতে তোমার বাঁ-চোখ নাচতে যাবে কেন ?

—তবে শোনো বলি। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রঙীন শুরু করে : আজ সন্ধ্যা থেকে তেতলার ঘরে ব্রজ-দুর্গামেটটা শুরু হবে ঠিক ক'রে সবাইকে নমস্করণ করেছি যে ! ওদিকে দাদা ফাউন্টেন 'পেনে কালি ভরে বসে থাকলো, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে !

বৌদি মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, বালাই, যাট ! এখনো

আমার লাল টুকটুকে জা আসে নি ! এখন কি অমন অলক্ষ্যে কথা বলে !

রঙীণ রাগ করে বলে, তোমার হাসি আমার ভালো লাগছে না !

বৌদি কোন রকমে হাসি চেপে জবাব দেয়, তা হলে ত' রঙীণ ঠাকুরপোর অবস্থা সঙ্গীন বলতে হবে । এই বলে বৌদি ঘরের কাজে অতাদিকে চলে যায় ।

রঙীণ ঠাকুরপোর অবস্থা সঙ্গীন না হোক সন্ধ্যা হতে বাড়ীর ছেলেপুলে থেকে সকলকাল অবস্থাই যে বিশেষ জটিল হয়ে উঠল সে কথা না বলেও বেশী বলা হয় !

সন্ধ্যার মুখে বারান্দায় কাগজপত্র সহ সৌখীনবাবু একটি ছোট টেবিল নিয়ে ঘাটি আগলে বসলো ।

সৌখীনবাবুর ছোট মেয়ে শিখা বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে । রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার বিশেষ দখল আছে ।

গানের ক্লাশ শেষ করে এস্রাজ হাতে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠছিল ; কণ্ঠে তার গানের কলি :

“আমার এ রিক্ত ডালি

দিবো তোমারি পায়ে—”

হাসির গল্পের লেখক খাসনবীশ মশাই উস্খুস করে উঠলো । তার পর গানটা নিকটবর্তী হওয়ায় যখন আরো স্পষ্টতর হল, সৌখীন ছন্ধার দিয়ে উঠলো, এই শিখা, তোর রিক্ত ডালির ঠালায় আমার মগজ যে খালি হয়ে যাচ্ছে, একটা প্লটকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম, গেল ফস করে পালিয়ে ।

সিঁড়িতে এসাজ পতন ও ভঙ্গের শব্দ শ্রুত হল, তার পরই মায়ের বুক মুখ লুকিয়ে শিখার সে কী কান্না।

মা সাস্থনা দিয়ে বল্লেন, তোমার বাবার গল্প পড়ে এত লোক হাসবে আর তুমি কি না কাঁদছ! ছিঃ! চোখের জল মোছো। অভিমানী মেয়েব কান্না কি কিছুতে থামানো যায়।

শেষকালে কোন একটা হাসির কথা মনে পড়ায় সেই ফোঁপানো কান্নায় ইতি পড়ে!

ওদিকে সৌখীন খাসুনবীশ পাতার পব পাতা লিখছেন আর মুখ বিকৃত করে ছিঁড়ে ফেলছেন! প্লট আর কিছুতে ভগ্ন হচ্ছে না। আদরের কুকুর টংরী একবার পায়ে নখ ঘসতে এসে তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে!

ছেলেমেয়েদের প্রাতিভেট টিউটার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। এ সব মনস্তাত্ত্বিক কোন খবরই তিনি রাখেন না। দোষের মধ্যে মাইনের জগৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার ছায়া এসে পড়েছে লেখকের খাতার ওপর।

মুগ না তুলেই সৌখীন চীৎকার করে উঠলেন, আপনি অচ্ছ নন যে আপনাকে ভেদ করে আমি আলো পাবো। সবে পড়ুন এখান থেকে!

মাষ্টার মশাই মুখ কাচুমাচু করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। মাইনে চাওয়া আর সাহসে কুলোলো না। নিশ্চয়ই মাষ্টারমশাই ব'সায় ফিরে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন নি। খাসুনবীশের গল্প পড়লেও হাসতে পারতেন কিনা সন্দেহ!

চাকর এসেছিল ছুটি চাইতে।

সে প্রথমে একচোট ধমকানি খেলো। তারপর তার ওপর হুকুম হ'ল, এই ব্যাটা, আজ সারারাত তোকে আমার সঙ্গে এই বারান্দায় থাকতে হবে। আমি রাত জেগে লিখবো, আর তুই আমাকে কফি তৈরী করে খাওয়াবি।

কর্তার মেজাজের সঙ্গে চাকর খানিকটা পরিচিত ছিল—ঝাড় কাৎ ক'রে বেচারী চলে গেল !

বারান্দার নানা কোণে পোড়া সিগারেট জমা হ'তে লাগল, সিগারেটের ছাই উড়ে বেড়াতে লাগল সর্বত্র—সৌখীন বারান্দায় পাগলের মতো পাইচারী ক'রে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, কিন্তু গল্পের প্লট যেন তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করল !

কালকে সকালের মধ্যে লেখা দিতেই হবে ; নইলে পূজা সংখ্যায় যাবে না ! পারিশ্রমিকও লোভনীয়—নগদ পাঁচশত টাকা।

খাসনবীশ মরিয়া হয়ে উঠল। কিসে মানুষ হাসে ?

জল-বিছুটি গায়ে লাগিয়ে দিলেও কি পাঠক-পাঠিকারা দম্ত বিকশিত ক'রে হাসবে না ?

হ্যাৎ দেখা গেল—অংশে-পাশের বাড়ীর জান্নাগুলিতে ভীড় জমে গেছে ! সেখানে ত' সবাই দাঁত বের ক'রে হাসছে ! ব্যাপার কি ?

ওরা কি সবাই গল্পের প্লট পেয়ে গেছে নাকি ? ছেলে, মেয়ে, গিন্নি, ন্যাড়া-নাখা কর্তা সবাই এত উল্লসিত হয়ে উঠেছে কেন ?

মনস্তত্ত্বের অকূল পাথারে খাসনবীশ থৈ পায় না। এমন সময় গিন্নি এসে সামনে দাঁড়ালো।

সেও কি লেখকের সঙ্গে রসিকতা করবে নাকি ?

ভ্রু কুঁচকে সৌখীন স্ত্রীর দিকে তাকালো । স্ত্রী বললে, তোমার ভাত কি আজ এখানেই দেবো ?

খাসনবীশ এইবার একেবারে ফেটে পড়ল ।

—ভাত ! ভাত রান্না করতে তোমায় কে বলেছে ? তুমি কি জান না, গরম লুচি আর চিংড়ি মাছের মালাইকারী না হ'লে আমার মাথায় প্রট আসে না ?

স্ত্রী জবাব দিলে, ঘরে একগুঁড়ো ময়দা নেই, লুচি হবে কোথেকে ? আর বাজার থেকে এসেছে পোনা মাছ !

খাসনবীশের মনে হল—সবাই একযোগে তার সঙ্গে যড়যন্ত্র করেছে । কেউ তাকে হাসির গল্প লিখতে দেবে না ।

সত্যি এইবার তাব কান্না পেতে লাগলো ।

হাসির গল্পের আড়ালে যে এত কান্নার বগা লুকিয়ে ছিল, এ-কথা সৌখীন খাসনবীশ ইতিপূর্বে ভেবে দেখে নি !

কিন্তু পাঁচ শ' টাকার মায়াও ত' চট করে ছাড়া যায় না ! তারা যেন সবাই একজোট হয়ে দাঁত বের করে ওর নাকের ডগার ওপর তিড়িং লাফ মারতে লাগল !

রাত এগারটা বেজে গেল, কিন্তু প্রট এগোয় নি এক ইঞ্চি !

হঠাৎ একটা বেড়াল মা-ও করে ডেকে উঠল ।

বাঘের মাসিটাকে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলে মনে হ'ল ।

খাসনবীশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আয়নাতে নিজের মুখ দেখতে লাগল । বেড়ালের মুখের সঙ্গে তার নিজের বড় বেশী সাদৃশ্য আছে বলে মনে হ'ল ।

তবে কি সে নিজেই হাস্তে ভুলে গেছে? তাই হামির
প্লট তার মগজে আদৌ বাসা বাঁধতে চাইছে না!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে শুরু করে দিল। হাসলে
তাকে এত খারাপ দেখায়
কেন? তো বড়ো নো
গালের দাগগুলি আরো
সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আরো—আরো জোরে
সে মরিয়া হয়ে দাঁত বের
করে • চীৎকার করে
হাসতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর
জান্নাটা আবার খুলে
গেল। একটা টাক-
মাথাওয়ালা লোক ভারী
গলায় বসে, মশাই, এটা ভদ্রপল্লী, রাত বাবোটার সময় মদ খেয়ে
হল্লার যারগা এটা নয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমরা পুলিশে
খবর দিতে বাধ্য হবো।

খাসনবীশ আবার উচ্চহাস্ত করে উঠল।

হামির গল্লব প্লট বিছাৎ-চমকের মতো তার মগজে এসে গিয়েছে।
ধন্যবাদ! সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে ওই টাক-মাথাওয়ালা
প্রতিবেশীটিকে। ভদ্রলোকেব নাম জানা নেই। নইলে তার নাম
নিয়েই খাসনবীশ গল্প শুরু করতো!



গভীর রাত...

সৌখীন খস্ খস্ করে লিখে চলেছে পাতার পর পাতা।
বারান্দাময় কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে...সেগুলিকে কুড়িয়ে জড় করবার
সময় পর্যন্ত নেই। পাশে চাকরটা ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডেকে
তুলে এককাপ কফি পানেরই বা সময় কোথায় ?

খাসনবীশের কলমে জোয়ার এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়
বলা যায়—

—“মস্তিষ্ক-কোটরবাসী

চিন্তাকীট রাশি রাশি

পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে !”

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। রাস্তায় জল দেবার
শব্দ শোনা গেল। সৌখীন তব্ লিখে চলেছে।

সূর্যোদয়ের আগেই তাকে গল্পটি শেষ করতে হবে।
লেখকের মনে হল এমন মজাদার গল্প জীবনে সে কখনো রচনা
করেনি !

সৃষ্টির অভিনব আনন্দ তার মুখকে দীপ্তিময় করে তুললো।
রাত্রি জাগরণেব কোনো ঘ্রানি আর সেই মুখে খুঁজে পাওয়া
গেল না।

সৌখীন শেষ পাতায় ইতি টেনে উঠে দাঁড়াল। সারা
বারান্দায় ছড়িয়ে আছে কাগজগুলি। ঠিক যেন বাগীর কমলবনের
রাজহংস তার শ্বেতপাখাগুলি ছড়িয়ে রেখে গেছে !

খাসনবীশ ছুটোছুটি করে পাতাগুলি কুড়িয়ে গুছিয়ে নিলে।

বেশ বড় গল্প হয়েছে।

একটি আলপিন দিয়ে পাতাগুলির হৃদয় ভেদ করলে। আঙুলে আল্পিনের খোঁচায় সে নিজের অজান্তে “উঃ” কবে উঠল।

এ কি সৃজনের সফলতায় আনন্দ-ধ্বনি?

সৌখীন সেদিকে আর দৃষ্টিপাত না করে জামা গায় দিয়ে গল্পটা পকেটে পুবে প্রথম ট্রানের জন্তে দরজা খুলে ফুটপাথে নেমে এলো।

সারাবাড়ী তখন ঘুমে অচৈতন্য।

সারাবাত মেশিন চলছে ‘রসালো’ কার্যালয়ে। সম্পাদক মশাই অতি প্রত্যাষে তন্দ্রাবিজড়িত চোখে ধূমায়িত চা পান করছেন। খাসনবীশকে দেখতে পেয়ে তিনি আর এক কাপ চা তার দিকে ঠেলে দিলেন।

সৌখীনের মনে হল এমন তৃপ্তিদায়ক চা সে জীবনে কখনো পান করে নি।

মুদ্রিত নেত্রে বলল, গল্পটা এনেছি।

সংবাদটিতে সে যে আনন্দোচ্ছ্বাসেব প্রতীক্সা করছিল, সম্পাদকের পক্ষ থেকে তা না পেয়ে চোখ খুলে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইল।

সম্পাদক বললেন, দেখুন খাসনবীশ মশাই, একটা কথা বলবার আছে। আপনার বড় গল্প যাচ্ছে শুনে শেষ মুহূর্তে এত বিজ্ঞাপন পেয়ে গেলুম যে, সেগুলি ফেরং দেবাব আর উপায় রইল না। সারারাত জেগে মেশিন চালিয়েছি। আজ সকালেই ‘রসালো’ বাজারে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সৌখীন বলল, বলেন কি? কিন্তু আমার গল্প? সম্পাদক বললেন, উপায় নেই খাসনবীশ মশাই।

সৌখীন বাধা দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে, আমি সারারাত জেগে
এই গল্প লিখেছি—

শান্তকণ্ঠে সম্পাদক জবাব দিলেন, এ ট্রাজেডি জীবনে নিত্য
ঘটেছে সৌখীনবাবু। রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’তে তার হৃদিশ
দিয়ে গেছেন—

“ঠাই নাই ঠাই নাই, ছোট এ তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি !”

সৌখীন খাসনবীশের মনে হল সম্পাদকের গালে একটি চড়
বসিয়ে দেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। আঙুলের দিকে
ঠঠাং চোখ পড়তে দেখলেন, পিনের খোঁচা লেগে সেখানে খানিকটা
রক্ত জমে আছে !



গণংকারের কাছ থেকে হাতটা টেনে নিয়ে অর্জুন প্রথমটা হো-
হো করে হেসে উঠল।

—বলছেন কি আপনি? আমি খুন করবো! নিরীহ স্কুল
মাষ্টার আমি। ছেলেদের চড়-চাপড়টা মারি বটে...তাই বলে
একেবারে খুন! সত্যি হাসালেন আপনি! এই জগুই লোকে
জ্যোতিষে বিশ্বাস করতে চায় না!

গণংকার একটু চটে উঠে জবাব দিলেন, বলছি কি আর সাথে মশাই ! গ্রহের ফের ! নইলে কেউ বা রাজা, কেউ বা পথের ভিখারী হয় কেন ! সবই ওই গ্রহের যোগাযোগ ! মানুষের সাধ্যি কি যে তা খণ্ডন করে !

অর্জুনও খুব বিরক্তি বোধ করল। বললে, আরে রেখে দিন আপনার গ্রহের ফের ! গণনার কিছু জানেন না, অথচ এসেছেন গণনা করতে ! বলুন দেখি আপনার নিজের মৃত্যু হবে কবে ?

গণংকার নাক সিঁটকে জবাব দিলেন, ভেবেছেন ওই কথা বলে আমায় ভড়কে দেন ? সে গণনাও করে বেখেছি মশাই ! • ৫৩ বছর ৩ মাস ১৬ দিনের দিন হবে আমার মৃত্যু। নিজের ছক বিচার করে স্থির করেছি—একেবারে অশ্রান্ত।

অর্জুন বাঙ্গ করে বললে, কত ঘণ্টা, কত পল, কত বিপল—সে সব কথাও বিচারে ধরা পড়েছে না কি ! এক কাজ করুন—আগে থেকেই শ্রাদ্ধটা চুকিয়ে ফেলুন, আমরা নেমন্তন্ন খেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচি।

গণংকার মূহ হেসে বললেন, অদিশ্বাসের কোনই কারণ নেই, কত পল, কত বিপল...অশ্রান্ত-ভাবে সে কথাও বলা চলে। দেখি আপনার হাত খানা আরেকবার।

নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অর্জুন তার হাতখানা আবার গণংকারের দিকে প্রসারিত করে দিলে।

গণংকার একদৃষ্টে অর্জুনের হস্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেমন নার্কি স্তনিপুণ মৎস্য-শিকারী ফাতনার দিকে তাকিয়ে

থাকে। ক্রমে তাঁর নাসা ক্ষীত হল—ললাট কুঞ্চিত হল—
চক্ষু আয়তনে ক্ষুদ্রাকৃতি হল। চোখের চশমা কপালের ওপর
তুলে তিনি বলেন, যথাযথ সময় জানতে চাইছিলেন না?
আপনার হস্ত রেখায় স্পষ্ট রয়েছে আজ রাত্রে মধ্যাহ্নে আপনি
খুন করবেন।

হো-হো করে অর্জুন রায় আবার হেসে উঠল। তারপর
অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, যদিও বা জ্যোতিষের ওপর খানিকটা
বিশ্বাস ছিল আপনার এই ভবিষ্যৎ-বাণীতে তা একেবারে উপে
গেল। আজ রাত্রে আমি খুন করবো? সেটা ত আর সম্ভব
পর হবে না, সুতরাং কাল সকালে এসে আপনাকে খুন ক'রে
যাবো। যদি মনের জোর থাকে ত কাল এখানে উপস্থিত
থাকবেন।;

হাস্তে হাস্তে আব মাথা নাড়তে নাড়তে অর্জুন বাড়ীর দিকে
পা চালিয়ে দিলে।

বাসায় ফিরেই অর্জুন তার টেবিলের ওপর একখানা চিঠি পেলে।
বন্ধু অর্ধেন্দু নেমন্তন্ন কবেছে।

এটা একটা সুখবর সন্দেহ নেই।

কেমনা অর্ধেন্দুর স্ত্রী নয়নতারা চমৎকার বান্ধা করে। বেশ
ক'রে স্নান ক'রে সে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবে। তারপর
জামা কাপড় পাণ্টে ভুরি-ভোজনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

রাস্তায় চলতে চলতে গণংকারের ভবিষ্যদ্বাণী তার মগজে কাজ
কবতে শুরু করলে। তাইত! আজ রাত্রে মধ্যাহ্নে সে খুন
করবে—গণংকার এমন কথা জোব করে বলতে সাহস করলে

কি ভাবে ! ওই ত ওর সামনেই একটা লোক মাথা গুঁজে পথ চলেছে। সে যদি পিছন থেকে জোরে একটা ধাক্কা মারে তবেই ত লোকটার পক্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটবে ! খুন করা এমন একটা কী শক্ত কাজ !

আরো একটা সহজ উপায় আছে।

মিলিটারী লরী হু-হু শব্দে রাস্তা দিয়ে চলেছে। একটা লোককে একটু ঠেলে তার সামনে ফেলে দেবার যেটুকু সামান্য প্রচেষ্টা। বেশী কষ্টও করতে হয় না সেজন্য।

এই তো দিবি ফুটফুটে একটি ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপন মনে খেলা করছে ! শুধু একটু বুড়ো আঙুলের টিপুনি !

*

*

*

*

আরে মোলো যা !

সে কী ভাবছে আবোল-তাবোল !

ভদ্র ঘরের সন্তান সে ! নিতান্ত নিরীহ স্কুল-মাষ্টার ! খামোখা একটা লোককে খুন করতে যাবে কেন ?

গণংকার একটা কথা বলেছে বলেই কি সে খুনী হয়ে গেল !

দ্রুতপদে অর্জুন বন্ধুর বাড়ীর দিকে রওনা হল। এতক্ষণে বুঝতে পারলে বেশ খিদে লেগেছে তার। পেটে যখন আগুন জ্বলে সেই সময়ই মগজের ভেতর অকারণ আবোল-তাবোল কথার উদ্ভব হয়।

যত বাজে অলস চিন্তা ।

অনেক দিন ধরে বাসায় ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে গেছে । বন্ধু-পত্নী নয়নতারার রান্নার হাতযশ আছে । আজ খাওয়াটা ভালই হবে ভেবে অর্জুন পদক্ষেপ দ্রুততর করে দিল ।

অর্ধেন্দুর বাসায় পৌঁছে দেখে, আরো সব বন্ধুরা সমবেত হয়েছে এবং সবাই তার জগ্গাই অপেক্ষা করে আছে । বন্ধুর দল সমবেত কর্তে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলে—, তারপর অনুযোগের সুরে শুধোলে, আরে ! বৌদির হাতের রান্না ! তোমার তবু আসতে এত গগংগচ্ছ ভাব কেন শুনি ? অগ্নি কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি ?

অর্জুন বললে, আরে না—না । আর যদিও বা নেমন্তন্ন থাকতো তবে বৌদির ‘অনাবে’ সেটা ‘ক্যান্সেল্’ করতে আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব হ’ত না ! আরে ভাই, বৌদির হাতের মাংস আর চাটনি... সে কি ভোলা যায় ! জিভে যেন লেগে রয়েছে !—ওহে অর্ধেন্দু পাত পড়েছে ত ?

অর্ধেন্দু রসিকতা করে জবাব দিলে, পাত প’ড়েছিল বহুক্ষণ আগে, এইবার পাত ফেলবার দরকার । আর বোধ করি সেই জগ্গাই তুমি সময় মত এসেছ ।

হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়ে সবাই খেতে বসল ।

খাবার মুখে তুলতে গিয়ে গগংকারের কথাটা আবার অর্জুনের মগজটা নাড়া দিলে ! ও যেন কেমন অগ্ন্যমনস্ক হয়ে গেল ।

নয়নতারা তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলে, রান্না বোধকরি আমার ভালো হয়নি, নইলে অর্জুনবাবু কিছুই মুখে তুলছেন না কেন ?

অর্জুন নিজেকে সচেতন করে তুলে বলে, না বৌদি ! রান্না খুব চমৎকার হয়েছে। আমি অল্প একটা কথা ভাবছিলাম।

নয়নতারা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে জবাব দিলে, উহ্ ! এটা আমার রান্নার পক্ষে মোটেই ‘কমপ্লিমেন্ট’ নয়। অপর এক বন্ধু নয়নতারার কথাটাকে সমর্থন করে কইলে, নিশ্চয় নিশ্চয় ! বৌদির রান্না চাখতে গিয়ে অল্প সব কথা ভুলে যেতে হয়...আমাদের^০ত এই-ই ধারণা। নয়নতারা ফোঁড়ন দিয়ে বলে, কথা গুলো শুনে রাখবেন অর্জুন বাবু !

অর্জুনের হঠাৎ মনে হল সেই গগংকাবের কথাটা। এক্ষুণি যদি ও হাতের কাছের কাঁসার প্লাসটা ছুঁড়ে মারলে তবে হয় বন্ধুটি, না হয় নয়নতারা পটল তোলেন...তার সঙ্গে সঙ্গে গগংকারের কথাটাও সত্যি হয়ে যায়। কিন্তু অনেক করে সে মনকে দমন করলে।

নয়নতারা বলে, নিশ্চয়ই অর্জুনবাবু কোথা থেকে খেয়ে এসেছেন—নইলে আপনার এমন অন্ধিদে ত কোন দিন দেখিনি !

স্নানমুখে অর্জুন জবাব দিলে আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই বৌদি, আপনারা ক্ষমা করুন—আমি উঠি।

অর্ধেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলে, তুমি আমার বৈঠকখানা ঘরটায় শুয়ে পড়গে। ওরে বৃন্দে, পাখাটা খুলে দে—

পেটে ক্ষিদে থাকা সত্ত্বেও অর্জুন বাইরের ঘরের করাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খাবার ঘর থেকে ক্রমাগত হল্লা-হাসি ভেসে আসতে লাগল।

অর্জুন ভাবলে, ওরা তাকে নিয়েই হাসি ঠাট্টা করছে না ত? মাথায় আবার খুনটা চেপে বসল। নাঃ, গণৎকারের কথাটাই বুঝি আজ সত্যি হবে!

অর্জুন শুয়ে থাকতে পারল না, উঠে বসল।

ঘরের এক পাশে অর্ধেন্দুর ডায়েল জোড়া রয়েছে। পরমানন্দে ওরা খাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাসির ফুলঝুরি! নয়নতারাও আজ খুব হাসছে।

নিশ্চই সবাই মিলে ওকে ঠাট্টায়-ঠাট্টায় মাটিতে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে!

অত্যন্ত মরিয়া হয়ে অর্জুন ডায়েলটা হাতে তুলে নিলে।

দেয়ালের গায় আয়নায় ওর ছায়া ভেসে উঠল। কী মুখ চোখের অবস্থা তার! ডায়েলটা রেখে থস্ থস্ করে অর্জুন একটা চিঠি লিখে অর্ধেন্দুর টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর অর্ধেন্দু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চীৎকার করে বসে, সর্বনাশ! অর্জুন কাকে খুন কবতে ছুটেছে... চিঠি লিখে গেছে!

চিঠিখানি পড়ে সবাই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।

নয়নতারা বাস্তব হয়ে বসে, নিশ্চয়ই অর্জুনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মুখ চোখের ভাব আমার তখুনি বিশেষ ভালো মনে

হলো না ! ওগো. তোমরা যাও—ওকে ধরে ফেল, নইলে একটা
কেলেঙ্কারী হবে !

ভরা পেটে বন্ধুর দল তক্ষুনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

অর্জুনকে ওরা যখন আবিষ্কার করলে সে তখন একটা
সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম থেকে
নাম্ছিল।



বন্ধুদের দেখে সে ছুটি
হাত উঁচু করে দেখালো।

একি ! তার ছ' হাত
একেবারে রক্তে রাঙা !

অর্ধেন্দু শিউরে উঠে
বল্লে, সর্বনাশ ! কাকে খুন
করে এলি অর্জুন !

নিশ্চিন্ত আরামে সে
জবাব দিলে, ট্রামের
বেঞ্চের প্রায় হাজার
খানেক ছারপোকা খুন

করেছি। এইবার আমি সত্যি ঘুমুতে পারবো।



রামশরণ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছে।

স্ত্রী বড় বাড়াবাড়ি অশুখ; তাই তাকে নিয়ে কিছুদিনের
জন্ম বায়ু পরিবর্তনের জন্তে কল্কাতার বাইরে যাওয়া একান্ত
আবশ্যক।

ডাক্তার বলেছেন, আজ যেতে পারলে যেন কালকের জন্তে
দেরী করা না হয়।

বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা রামশরণের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নয়।

সত্যিকথা বলতে কি তুড়ি দেওয়ার মতোই একটা সহজসাধ্য ব্যাপার।

শুধু একটি চেকে নাম সই করে দিলেই প্রয়োজনীয় টাকা আধঘণ্টার মধ্যে ঘরে এসে পৌঁছবে।

যত ভাবনা নিজের পৈতৃক বাড়ীটিকে নিয়ে।

বাড়ীর জন্য যে এত মাথা বাথা হতে পারে তা' আগে কে ভেবে রেখেছিল ?

পিল্ পিল করে পোকাকার মতো লোক আসছে চারদিক থেকে। কলকাতায় পা বাড়ানোর যায়গা নেই।

ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে গেলে প্রতি মূহূর্তে লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগবার সম্ভাবনা। ট্রামে কিম্বা বাসে যদি উঠতে চাও ত' বাহুড়-বৃত্তি অভ্যাস করতে হবে। পয়সা থাকলে ট্যাক্সিতে চাপতে পারো, কিম্বা নিজে গাড়ী কিনে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে ছুটোছুটি করতে পারো, কিন্তু পেট্রোল বাড়ন্ত। ফলে তোমার কেনা গাড়ী গ্যারেজেই গুদোমজাত থাকবে।

বাজারে গিয়ে কোনো জিনিস ছোঁবার যো নেই। দাম শুন্লে শক্ খেতে হবে।

এই পোকা-মাকড়গুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল রামশরণ ভেবে পায় না।

“যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
হরে মুরারে……”

ভেবে ভেবে রামশরণ ছুটো সিগার পুড়িয়ে শেষ করে ফেলে ; সেই ভদ্ররাশির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, আজ যদি পরিবার নিয়ে বায়ু পরিবর্তনে পাড়ি জমাই, তবে খালি বাড়ী পেয়ে এই পিল-পিলে পোকাকার দল তার গৃহে এসে আশ্রয় নেবে। চাই কি সরকার বাড়ীটি দখল করে একটি আশ্রয়-কেন্দ্রই খুলে দেবে। ছ'মাস পরে কলকাতায় ফিরে এসে তাকেও ওই পোকা-মাকড়ের দলে নাম লিখিয়ে ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুরে বেড়াতে হবে।

বাড়ী থাকার যে এত বিপদ সেকথা কি তার পিতামহ দুর্গাশরণ ভাবতে পেরেছিল ? স্বর্গত পিতামহ সুখে থাকুন, কিন্তু রামশরণ এই 'বাস্তুভিটা সমস্ঠায়' তিন রাত্রি ঘুমুতে পারছে না।

বাড়ীটিকে ত' আর বহন করে বায়ুপরিবর্তনে নিয়ে যাওয়া যায় না ! এর চাইতে ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করা ছিল ভালো ! মাস-মাস ভাড়া গুণে দিলেই দায়মুক্ত হতে পারত।

দু-একটি আত্মীয়-স্বজনের নাম স্মরণে আনবার চেষ্টা করলো রামশরণ। কিন্তু বিপদ সেখানে আরো ঘনোভূত হতে পারে। ছ'মাসের নাম করে এসে তারা যদি অধিকতর আত্মীয়তায় আপ্ত হযে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে তবে তাদের স্থানচ্যুত করবে কি করে ?

এ যে একেবারে জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ !

রামশরণ ঘামে আর ঘন-ঘন সিগার টানে !

হঠাৎ তার শ্যামসুন্দরের নামটা মনে পড়ে গেল। শ্যামসুন্দর রামশরণের কলেজ-জীবনের সহপাঠী। চিরকাল পরের উপকার করে

যাওয়াই তার পেশা। সারাটা জীবন অশ্রুর দিকে বেশী দৃষ্টিপাত কবতে হয়েছে বলে নিজের প্রতি আর নজর দেবার সময় তার হয়ে ওঠেনি। স্মৃতরাং সে অকৃতদারই রয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। শ্যামসুন্দরই রামশরণের শ্যাম আর কূল দুই-ই বজায় রাখতে পারবে !

নিশ্চিত হয়ে মুখের সিগার নিভিয়ে ফেলে তিনি নৈশ-উপাধানের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

শ্যামসুন্দর থাকে বেলঘাটার এক বস্তি অঞ্চলে।

সেখানে সে একটি নৈশ-বিদ্যালয় চালায় আর বস্তিবাসীদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করে।

চা-পর্ব সমাধানের পর সকালেই রামশরণ নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করে বেলঘাটা অভিমুখে রওনা হলো। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে তার একটা সঙ্কোচ বোধ হল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামশরণের বন্ধু যে বেলঘাটার বস্তি অঞ্চলে বসবাস করে একথা তাব গাড়ীর চালককে জানানোর এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে? নিজের 'প্রেস্টিজ্' বলেও ত' একটা কথা আছে। নিজের স্বার্থের খাতিরে বস্তীর অধিবাসীকে খোসামোদ করতে হচ্ছে তার। ধনীর তথাকথিত সম্মানের মোহে এ সব ব্যাপারের সাক্ষী না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা সিগার ধরিয়ে রামশরণ দ্রুত অগ্রসর হল। তার বরাং ভালো যে শ্যামসুন্দরকে বস্তিতেই পাওয়া গেল। শ্যামসুন্দর মালকোচা মেরে বস্তির ড্রেনগুলিতে কেরোসিন তেল ঢালছে। সঙ্গে এক পাল ছেলে।

রামশরণ ধূমকেতুব মতো হাজির হয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তোমার সঙ্গে আমার ভারী জরুরী দরকার আছে শ্যামসুন্দর।

রামশরণকে হঠাৎ সেখানে দেখতে পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে জবাব দিলে, আরে! ব্যাপার কি ভাই? গরীবের বাড়ীতে যাকে বলে একেবারে হাতির পা!

—বাজে কথা রাখ শ্যাম, শীগগির আমার গাড়ীতে উঠে আয় দিকি।

রামশরণ বিশেষ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে।

শ্যামসুন্দর বিব্রত বোধ করে। বলে, কিন্তু ভাই, আমি যে একটা দরকারী কাজ করছি। অনেক কষ্টে কর্পোরেশনের কাছ থেকে এই কেবোসিনটুকু পাওয়া গেছে। কাউন্সিলারের কাছে এজন্য ঘুরতে হয়েছে প্রায় দু'মাস।

রামশরণ জানে শ্যামসুন্দরের দুর্বলতা কোথায়। তাই এবার অব্যর্থ শর-সম্ভান করে।

মুখখানাকে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো করে জবাব দেয়, তোর বৌদির খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ক্রমাগত তোর কথাই বলছে। একবার না গেলে চলবে না ভাই।

শ্যামসুন্দর এই বৌদির কাছ থেকে অনেক স্নেহ আর প্রীতি পেয়েছে। যখন তার একেবারে খাওয়া জুটত না—এই বৌদি তাকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে গিয়ে নিজে সামনে বসিয়ে যে কতদিন খাইয়েছে তার হিসেব মেলে না। তবে শ্যামসুন্দর একটি খবর রাখে না যে, এই সব বাহুল্য ব্যাপারে রামশরণ তখন মনে মনে

অখুশীই হয়েছে ! কিন্তু কল্যাণী কারো কথা শোনে নি। এই ছন্নছাড়া দেবরটিকে খাইয়ে তার যে তৃপ্তি হত তাকে সে ঠাকুর সেবার কাজ বলে মনে করত।

রামশরণ ঠাট্টা করে বলত, দুর্ভাগা আমার যে স্বদেশী লোক হতে পারিনি...তাহলে কল্যাণীর কাছ থেকে খাতির-যত্ন পাওয়া যেত।

শ্যামসুন্দর মুখ টিপে-টিপে হাস্ত আর কৌতুক করে জবাব দিত, অনেক সময় ছন্নছাড়াদের ওপরই অল্পপূর্ণার কৃপা বর্ষণ হয়। বৌদি তেল-মাথায় তেল দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

রামশরণ হো-হো করে হেসে উঠে মনের কালো মেঘটাকে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করত, কল্যাণী চটে ভ্রুভঙ্গী করত আর শ্যামসুন্দর দুজনকে দেখিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকত, যেন জীবনে কোনো দিন কিছু খায় নি !

সেই কল্যাণী বৌদির কাছ থেকে আহ্বান এসেছে। শ্যামসুন্দর কি তা অবহেলা করতে পারে ? ছেলেদের হাতে কেরোসিনের টিনটা দিয়ে নির্বিবাদে সে গিয়ে গাড়ীতে উঠল।

যেন মন্তুর পড়ে সাপকে একেবারে কাবু করে ফেলা হয়েছে।

কল্যাণীর চেহারা দেখে শ্যামসুন্দর একেবারে আঁৎকে উঠল। তবু ঠাট্টা করে বিষয়টাকে হাক্বা করবার জন্মে বলল, রামশরণ আপনাকে খেতে দেয় না—একথা ত' কখনো শুনিনি। প্রদর্শনীতে দেবার মতো চেহারা করে তুল্লেন কি করে ?

কল্যাণী বলল, বিশ্বের খবর নিয়ে যে সব সময় চিন্তিত, আমাদের কথা মনে রাখবার সময় তার কৈ ?

কল্যাণীর কথাটাকে চাপা দেবার জ্ঞাত শ্যামসুন্দর বলে উঠল,
আপনি স্মরণ করেছেন বলেই ত' তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।

—আমি স্মরণ করেছি ? কল্যাণীর চোখে-মুখে বিস্ময়।

রামশরণ দেখলে সব কথা এক্ষুণি ফাঁস হয়ে যাবে—আর
তার সমস্ত প্ল্যান ডুবে যাবে অগাধ জলে। তাই সিগারে একটা
টান দিয়ে বলে, তোমার অসুখের খবর পেয়ে ও চুপ করে বসে
থাকতে পারে নাকি ? রাস্কেলটা সত্যি বিশ্বের উপকারেই মত্ত
ছিল। আমিই ত' ধরে নিয়ে এলাম।

শ্যামসুন্দর বলে, আপনার শুশ্রূষার ভার আমি নিলাম বোদি।
আপনাকে ভালো করে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

রামশরণ দেখলে—সমস্ত ব্যাপারটাই ‘উন্টা বুঝিলি রাম’ হয়ে
যাচ্ছে। এভাবে খাল কেটে কুমীর আনবার পক্ষপাতি সে নয়।
চট করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, শ্যাম, কল্যাণীর চিকিৎসা
সম্পর্কে তোর সঙ্গে আমার জরুরী পরামর্শ আছে। আয় ত'
আমার সঙ্গে—

শ্যামসুন্দরকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই রামশরণ তাকে
নিয়ে বসবার ঘরে চলে গেল।

সেইখানে নিরাপদ গভীরে বসে সে খুলে বলল তার প্ল্যান।

শ্যামসুন্দর জবাব দিলে বেশ ত' ! ডাক্তার যখন বলেছে,
বৌদিকে নিয়ে কালই চেষ্টা চলে যাও। বাড়ীভর ভার আমি নিলাম,
তোমার কোনো চিন্তা নেই। ঘরগুলো সব তালা বন্ধ করে চাবি
আমার কাছে দিয়ে যেও। মাঝে মাঝে খুলে আমি চাকরদের দিয়ে
পরিষ্কার করিয়ে রাখ বো।

এইবার রামশরণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সেইদিন রাত্তিরে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারলে।

কলাগীকে নিয়ে রামশরণ গিরিডি চলে গেছে।

বিরাট বাড়ীতে শ্যামসুন্দর একা। দুটি চাকর অবশ্য আছে। তারাই বাড়ী ঝাড়-পোছ করে আর শ্যামসুন্দরকে রান্না করে খাওয়ায়। কলাগী কোনো ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ রেখে যায় নি। রোগশয্যায় শুয়েও সকল দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

খালি 'বাড়ীতে শ্যামসুন্দরের আর সময় কাটতে চায় না। তারপর চঠাং একদিন উৎসাহিত হয়ে সে প্রবন্ধ লিখতে বসে গেল। পূর্ববঙ্গবাসীরা কেন বাস্তবভিটা ত্যাগ করে দলে দলে কল্‌কাতায় চলে আসছে এই হচ্ছে প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

লেখাটি যখন প্রায় অর্ধসমাপ্ত তখন চঠাং একদিন বাড়ীর দোর গোড়ায় সতোশের সঙ্গে হাব দেখা। সতোশ বাস্তব্যাগীদের আশ্রয়দানের কাজে দিন রাত পরিশ্রম করছে—তার নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই! সর্বদা বাস্ত-বাগিস...দাড়ি কানানোর কুবসংও তার কদাচিৎ মেলে!

মোটো চশমার ফাঁকে বাস্ত-চোখ সব সময় উকি মারে। সতোশ অবাক হয়ে বলে, আমবা তোকে গক খোঁজ করে মরছি আর তুই এখানে পালিয়ে রয়েছিস হতভাগা? Coward! কি করছিস এখানে শুনি?

অপরোধী মতো শ্যামসুন্দর জবাব দিলে, কেন সবাই বাস্তত্যাগ করে আসছে সেই সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছি।

প্রবন্ধ ! সত্যেশ যেন সাততলা বাড়ীর ওপর থেকে ফুটপাথের ওপর পড়ে হাড়গোড় ভেঙে যেন্নে ।

প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে কাজ করে সমস্যার সমাধান করা যায় না—প্রবন্ধ লিখে সেই জটিল গ্রন্থি সে খুলতে চায় ?

হাস্কা হাসি দিয়ে সত্যেশ শ্যামসুন্দরের গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের ‘গ্র্যাভিটি’ নষ্ট করে দিলে ।

সত্যেশ একবার বাড়ীটাব দিকে তাকিয়ে বন্নে, এই বাড়ীতে তুই থাকিস্ ?

—ভঁ

—বাড়ীটা কাব শুনি ?

— আমার এক বন্ধুর । তারা চেঙে গেছে ।

সত্যেশ যেন ‘ইউক্লিডেব’ এক জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে । বন্নে ‘ইউরেকা’ । তারপর শ্যামসুন্দরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলে, ঘরে বসে কাগজ-কলম নষ্ট না করে ‘আমাব সঙ্গে চল—শেয়ালদা’ ষ্টেশনে । দেখ্‌বি কত পরিবার না খেয়ে পড়ে আছে । কত শিশু দুধ পাচ্ছে না, কত লোক সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়েছে ।

শ্যামসুন্দরের ভেতরকার কমী-মানুষটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল । বন্নে, নিশ্চয়ই যাবো ।

সত্যেশ জবাব দিলে, শুধু গেলে হবে না, তাদের এই বাড়ীতে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিতে হবে ।

রামশরণের গম্ভীর মুখটা তার মনের আকাশে ভেসে উঠল । সে একটু ভয় পেয়ে গেল ।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র।

তার পাশেই সে দেখতে পেল কল্যাণীর কলাগময়ী মূর্তি।

শ্যামসুন্দর তার সমস্ত দ্বিধাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললে, ঠিক কথাই বলেছিস সত্যোশ! প্রবন্ধ লিখে তাদের ভিটে ছেড়ে আসবার প্রকৃত কথা জানা যাবে না! তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশতে হবে। তুই চলে যা ট্রেনে। আমি ততক্ষণ চাকরদের দিয়ে ঘরগুলো খুলে ফেলে ওদের থাকবার ব্যবস্থা করে দি—

সত্যোশের কারামতি আছে বলতে হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে লম্বা, বেঁটে, কঁচো, খোঁড়া, বাতে-পন্দু, অর্ধমৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ধাঁচের আর ঢঙের আবাল-বৃদ্ধ-বন্দির ভাড়াখানি পূর্ণ হবে ফেলে। এ ছাড়া শিশুর দল ত' আছেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের কোলাহলে আর কলরবে মনে হল বাড়িতে বুঝি রথেন-মেলা বসে গেছে।

চাকর ছুটি বাবুব কাণ্ড-কাবখানা দেখে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বান্ধা ঘরে গিয়ে অশ্রয় গ্রহণ করলে।

ইতিমধ্যে শ্যামসুন্দর সকলের ইতিহাস আবিষ্কারের তৎপর হয়ে উঠেছে। কে কোথা থেকে এসেছে, কার কত জোত জমি ছিল, কি জাতীয় অত্যাচারে তারা ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে... এই সব চাকরদের কাহিনী—যা নাকি উপন্যাসের চাইতেও উদ্দীপনাময়!

সত্যোশ কিন্তু আরো প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। সরকার থেকে রেশনের ব্যবস্থা করে চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি নিয়ে আসছে ভারে ভারে।

বাড়ীতে যেন মহোৎসব লেগে গেল।

শ্যামসুন্দরও কম যাত্ন জানে না।

চাকর দুটিকে মিষ্টি কথায় বশ করে তাদেরই লাগিয়ে দিয়েছে
রান্না ঘরের কাজে।

দাউ-দাউ করে উল্লুন জ্বলছে।

কচাকচ্ তরকারী কোটা হচ্ছে...

টগ্‌বগ্‌ চাল ফুটছে...

ঝপাঝপ্ জল মাথায় পড়ছে...

ঠকাঠক্ খুন্সি কড়াইতে নড়ছে...

হাঁ, যজ্ঞিবাড়ী বলতে হবে বৈ কি!

কিন্তু শ্যামসুন্দরের ধনুকভাঙা পণ।

কেউ বসে খেতে পারবে না।

তাই মেয়েরা ঝড়ি তৈরী করছে, ঠোঙা বানাচ্ছে, চামড়ার বাগ
তৈরী করছে, শেলাই করছে, ছবি আঁকছে; আর ছেলেরা বই
বাঁধাচ্ছে, চাটক খলি তৈরী করছে, রবার ষ্টাম্প বানাচ্ছে, তুলোট
কাগজ তৈরী করছে—এমনি কত কি কাণ্ড...

গোটা বাড়ীখানা যেন কারখানা হয়ে উঠেছে...

শ্যামসুন্দর আর সত্যেশের স্নান-খাওয়ারও সময় নেই।
সরকারী পরিদর্শক এসে বলে গেছে—এইটাই হচ্ছে—সেরা আশ্রয়-
প্রার্থীর শিবির। সঙ্গে সঙ্গে সাতাযোর পবিমাণও বেড়ে গেছে,
অনেকটা।

ওদিকে গিবিডি থেকে রামশরণ ক্রমাগত চিঠি লিখে জবাব না
পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল।

কলাগী বললে, যাওনা—একবার ঘুরে এসো। তোমার বন্ধু
বেঁচে আছে, কি মরে গেছে সেটাও ত' খবর নেয়া দরকার।

রামশরণ বললে, তুমিও ত' ভালো হয়ে গেছ। যেতে হয় দুজনে
এক সঙ্গেই যাবো। কল্‌কাতা ছেড়ে আর আমি থাকতে পারছি নে।

স্বামী-স্ত্রী বাড়ীতে পদার্পণ করে একেবারে অবাক !

খবর পেয়ে শ্যামসুন্দর ছুটে এসে বললে, বৌদি, আপনাবা
চলে এসেছেন! বেশ হয়েছে। আপনাব শরীর ত' দিবা
ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু এ বাড়ীতে সবাই খেটে খায় আপনাকে

কিন্তু হেসে লেব
সুপারিটেটেড হাঁত
হবে।

কলাগী একবার
স্বামীর দিকে চেয়ে
মুচকি হেসে রান্না-
ঘরের দিকে চলে
গেল।

এইবার রাম-
শরণের হাঁস হল।

চীৎকার করে বললে,
আমার বাড়ীটাকে
ধর্মশালা করে

তুলেছিস্? আচ্ছা, আমার নাম রামশরণ...দেখে নেব তোকে।

এই বলে সে ঝড়ের মতো বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।



আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, রামশরণ উকিলের পরামর্শ নিচ্ছে—শ্যামসুন্দরের নামে মামলা দায়ের করবে। অভিযোগ—সে তার গৃহ আর গৃহিণী অবৈধভাবে কেড়ে নিয়েছে। নিজের ওজনে সে বিচার চায়। ফাইল তৈরী হচ্ছে।

চাপ্‌ল্যকর নামলা সন্দেহ নেই।

আমরা ফলাফল জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। পাঠক-পাঠিকারাও সংবাদপত্রের পাতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।



অবশেষে

তখন শিল্পী করঞ্জাক কাঞ্জিলাল সকাল থেকে নতুন টিউব খুলে, প্যালেট ভর্তি রঙ নিয়ে ক্যানভাস্ সাজিয়ে বসে আছেন। তরুণী গায়িকা মঞ্জুলিকা মিহির পোর্টেট আজ শূন্য করতে হবে।

বালিগঞ্জের এক জলসায় মঞ্জুলিকার সঙ্গে করঞ্জাকের পরিচয় হয়। সাত দিনের মধ্যে সেই পরিচয় স্মৃতিবিড় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সামনে বড় দিনের মরশুমে কলকাতার বাজার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে মশগুল হয়ে থাকবে। শিল্পী করঞ্জাকের একান্ত বাসনা, তরুণী

মঞ্জুলিকার একখানি ছবি একে কোনো প্রদর্শনীর গৌরব বৃদ্ধি করেন।

মঞ্জুলিকার অবসর অত্যন্ত কম। গানের মজলিসে, র‍েডিওর আসরে, রেকর্ডের কাজে, সিনেমার প্লে-ব্যাকে, বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে মঞ্জুলিকা সর্বদাই অতি ব্যস্ত।

পর পর অনেকগুলি দিনকে হালকা হাওয়ায় বইয়ে দিয়ে করঞ্জাফ আজকের এই বিশেষ দিনটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে রেখেছেন ওর ছবি আঁকবেন বলে। মঞ্জুলিকাও স্মিত-হাস্যে কথা দিয়েছে, আজকের সমস্তটা দিন শিল্পীর স্টুডিওতে কাটিয়ে যাবে। শিল্পী 'করঞ্জাফ' আগের দিন থেকেই সকল রকমে প্রস্তুত হয়ে আছেন। সিটিং দিতে দিতে যদি অবসাদ আসে তবে শিল্পী মঞ্জুলিকাকে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনাবেন। মাঝে মাঝে মঞ্জুলিকার রেকর্ডগুলি বাজিয়েও ওকে অবাক করে দেবার একটা পরিকল্পনা শিল্পীর মগজে বাসা বেঁধে আছে। খুব নাম করা একটি হোটেলে দু'জনের জগো দামী খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছে।

মঞ্জুলিকা ফুল ভালোবাসে।

তাই নিউ-মার্কেট থেকে নানা জাতের ফুল আর তোড়া এসেছে ...সুগন্ধী এবং গন্ধহীন। নানা আকারের রূপ লাভ করা সেই পুষ্পগুচ্ছগুলিকে সাজানো হয়েছে নানা যায়গায়। যাতে এই ফুল দেখেই মঞ্জুলিকার মুখে মুহূ হাসি ফুটে ওঠে! সেই মধুর হাসি অক্ষয় হয়ে থাকবে ক্যানভাসের বুকে! মোনোলিসার হাসিকে আজ হারিয়ে দেবে শিল্পী করঞ্জাফ।

*

*

নবীন অধ্যাপক বীরেশ্বর বটব্যাল ।

প্রাচীন মূর্তির মধ্যে ইতিহাসেব হারিয়ে যাওয়া কাহিনী আবিষ্কার করে বেড়ান । মঞ্জুলিকাব মূর্তি সংগ্রহের 'হবি' আছে । সেই সূত্র ধরে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ।

আজ অধ্যাপক বটব্যাল যাচ্ছেন, সারনাথে পাওয়া কি একটি প্রাচীন মূর্তির আলোক-চিত্র তুলে আনতে । কথা আছে মঞ্জুলিকা যাবে তাঁর সঙ্গে ।

অধ্যাপক নিরস পুঁথি ঘাটার ভেতর যেন কলা-লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন । তাই একান্ত আগ্রহে দুটি বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছেন । আজ বাত্রে ওরা দুটিতে যাত্রা করবেন । নিকরদেশ যাত্রা অবশ্য নয়, পথের শেষ আছে — কিন্তু অধ্যাপক মনে মনে কামনা করছেন সে পথ যেন না ফুরায় ! সকাল থেকে যাত্রার তোড়-জোড় চলছে । টিফিন কেবিয়ার ভর্তি মুখরোচক খাবার নিয়েছেন সঙ্গে । খালি পেটে আলোচনা জন্মে না, তা কবিতারই হোক, আর ইতিহাসেবই হোক ।

*

*

*

নতুন গানে সুব দিয়েছেন সুব শিল্পী পল্লবকুমার । এই গান খানি মঞ্জুলিকার কাছে কেমন শোনাবে অমুমান করে সুবশিল্পী ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে উঠছেন । আপন মনেই মাথা হুলিয়ে হুলিয়ে তাল দিচ্ছেন ।

মঞ্জুলিকা আগ্রহ করে চিঠি লিখেছে । আজ নীরব ছপ্পরে এসে গান খানি গলায় তুলে নেবে । সেই গান সে গাইবে বিভিন্ন আসরে, ছড়িয়ে দেবে বেতারের তরঙ্গে-তরঙ্গে, অক্ষয় কবে রাখবে রেকর্ডের বুকে । আর কোনো চিত্র-পরিচালক যদি সুপ্রসন্ন হন তবে একখানি

নতুন ছবিতে এই বিশেষ গানখানি মঞ্জুলিকাকে দিয়ে প্লে-ব্যাকে গাওয়ানো হবে।

মনে মনে একটা মধুর আহমেদের সঙ্গে ফাইভ পারসেন্ট রয়ালটির অঙ্ক কসছেন—সুবশিল্পী। (ইনি অঙ্ক কসতে থাকুন—আমরা সেই অবসরে অন্ত্র গমন করি।)

*

*

*

টি, পি, সরকার জুয়েলারের দোকান।

টি, পি, সরকার অবশ্য এখন নৈচে নেই—যদিও তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। টি, পি, সরকারের নাতির বড় ছেলে এখন দোকানের মালিক। সেট্রাল এভিনিউ-এ বিরাট শো কেস। পথ চলতে পথিকেরা থম্কে দাড়িয়ে ছ'দণ্ড তাকিয়ে থাকে।

তকণ জুয়েলার রত্নমণি সরকার আপনার খাস-কামরায় বসে মৃদুসরে শীঘ্র দিচ্ছেন।

মঞ্জুলিকার সঙ্গে তার আলাপ এই গরমা তৈরীর ব্যাপার নিয়েই। এখন ঘনিষ্ঠতা এত বেশী হয়ে গেছে যে, সম্বোধনের ব্যাপারে তুমির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

হ্যাং কি মনে করে রত্নমণি সরকার টেলিফোনের চোঙটা হাতে তুলে নিলেন।

—বড়বাজাব ডবল জিরো থি—

—কে কথা বলছেন?

—ও! মঞ্জু! আমি রত্নমণি!

—কি খবর? হ্যাং টেলিফোন যে!

—একেবারে নতুন প্যাটার্ণের নেক্লেস তৈরী হয়ে এসেছে।

তোমার ,গলায় না উঠলে এর আসল চেহারা যাচাই করা
যাবে না।

—বল কি ! এই যে সেদিন মুক্তোর মালা দিলে !

—সে কথা আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। আজ সন্ধ্যাবেলা
দোকানে আসবে একবার ?

—না, না। যখন ক্যাশমেমো কাটবে না—দোকানের
লোকগুলো প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। সে
ভারী বিচ্ছিবী হবে !

—আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ওটা নিয়ে আমি লাইট
হাউসে যাচ্ছি। সন্ধ্যা ছটার শো।

—কিন্তু সিট্ পাবে কি ? আজকেই নতুন ছবি খুলছে।

—সেজন্য তুমি ভেবো না লক্ষ্মিটি ! এক্ষুনি আমি ফোনে বুক
করে রাখছি।

—আচ্ছা।

—মনে থাকে যেন। সন্ধ্যা ছটার শো। লাইট হাউসে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ডার্লিং ! ইউ আর সো সুইট !

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এবার শীঘ্র দিতে লাগলো রত্নমনি
সরকার।

*

*

*

ইম্প্রেশনারী ও ত্রিমানে কলকাতায় অভিজাত মহলে দিক্রম
বন্দ্যোব খ্যাতি ও সুনাম ছুই-ই আছে। শতাব্দের তথাকথিত
সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় তাঁর কল্যাণে বহু রকম নাচ দেখে নয়ন-মন
চরিতার্থ করে থাকে।

হঠাৎ বন্দ্যার ছোট্ট সবুজ রঙের গাড়ী খানি এসে দাঁড়ালো
মঞ্জুলিকার দোর গোড়ায়।

মঞ্জুলিকার চোখে-মুখে বিস্ময়। শুধোলে, কি খবর? এমন
অসময়ে চাঁদের উদয় যে!

বিক্রমের এতটুকু অপেক্ষা করবার ফুরসৎ নেই। মঞ্জুলিকার
ডান হাতে এক গোছা কার্ড গছিয়ে দিয়ে বলেন, শোনো, জরুরী
দরকার তোমাকে। আসছে কাল রবিবার সকালে জাপানী নর্তকা
মা সোয়ে তাঁর ডান্স দেখাচ্ছেন। তোমার কিন্তু উদ্বোধনী-সঙ্গীত
গাইতে হইবে। কার্ড দিয়ে গেলাম। যাকে-যাকে ইচ্ছে সঙ্গে নিয়ে
যেও। তাছাড়া আমি ত'লবীতে হাজির থাকবোই।

মঞ্জুলিকা হাসিখুশীতে উজ্জল হয়ে উঠে উত্তর করলে, জাপানী
মেয়ের নাচ! সামনা-সামনি কক্ষনো দেখি নি! শুধু ছবিতেই
দেখেছি। সত্যি বলছ ত বিক্রম?

বিক্রম বন্দ্যো চোখ ছুটো একবার নাচিয়ে বলে, সত্যি নয় ত'
কি তোমার কাছে বাজে কথা বলবার লোক আমি? জাপানী নাচের
আগে কিছ্র চাই তোমার গলার গান।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়। গান আমি শোনাবো বৈ কি। একেবারে
নতুন একটা গান হলেছি। মনে হবে, তোমাকে বলছি আমি কানে-
কানে। সেই গান শুনিতে দেবো সবাইকে।

একটুখানি থেমে মঞ্জুলিকা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কোথায় হবে
—তাতো কিচ্ছ বলে না?

ডান হাতের চেটেটাটা মঞ্জুলিকার মুখের সামনে উল্টে দিয়ে ত্রিপাঠী
বলে, এ সব নাচ নিউ এম্পায়ার ছাড়া আর কোথায় জমে বলা?

কার্ডে সব লেখা আছে। একবার কষ্ট করে চোখ বুলিয়ে নিও লক্ষ্মিটি !

—তা না হয় নেবো। কিন্তু সময় মত আমার কাছে গাড়ী পাঠাবে ত ?

—হ্যাঁ ভালো কথা মঞ্জু। আমি ওদিকে জাপানী পাটিকে নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত থাকবো। ওদের ড্রেসই আসবে সাতটা প্যাকিং বাক্স ভর্তী। সত্যি, গোলমালে হয়ত সময়ের ঠিক থাকবেনা। তুমি



একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যেও। আমি বুকিং অফিস থেকে টাকা দিয়ে দেব। তুমি কোনো অসুবিধেয় পড়বেনা লক্ষ্মিটি ! কিন্তু তুমি না গেলে আমি পড়ব একেবারে অগাধ-জলে। উদ্বোধন-সম্প্রদায় না হলে ত' আর “ফাঙ্কশন্” শুরু হতে পারে না !

মঞ্জু মিটি-মিটি হেসে উত্তর দিলে, O. K.

না করে বিক্রম বন্দ্যার গাড়ী পেরিয়ে গেল।

*

*

*

চিত্র-পরিচালক ধ্রুবরত্ন মালাকরের নতুন পৌরাণিক চিত্র “মা বামুণী” আজ মহরৎ-উৎসব।

ধুবন্ধরের একান্ত বাসনা যে, অতি পরিচিত মুখগুলিকে সুযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা মেয়েকে তিনি নাগ্নিকার ভূমিকায় অভিযুক্ত করবেন।

মাটি যখন কাদার মতো নরম থাকে তখন যে কোনো ছাঁচে তাকে গড়ে তোলা যায়। সেই নরম কাদার সন্ধান পেয়েছেন তিনি তরুণী সুদর্শনা মঞ্জুলিকার মধ্যে।

মঞ্জুও তাঁকে আগ্রাস দিয়েছেন যে, তাঁর পরিকল্পিত নতুন ছবিতে শুধু ক'ই দেবে না—কায়াও দান করবে স্বচ্ছন্দচিত্রে।

আজকের মহরত-এর একটি দৃশ্য গৃহীত হবে মঞ্জুলিকাকে কেন্দ্র করেই। পরিচালক এই আদিকারের কথা সাংবাদিকদের পূর্বাঙ্কে জানিয়ে রেখেছেন। সবাই আজ উৎসবে সাগ্রহে যোগদান করবেন নব-তারকার উদয় অবলোকন করতে।

শিল্প-নিদেশক মঞ্জুলিকার জন্তে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্যাটার্ণে পবিচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। অবশ্য প্যাটার্ণটা অজ্ঞতার অনুকরণে হয়েছে কিনা সেকথা অনুমান করা কষ্টসাধ্য! এই পবিচ্ছদ পরিধান করে তব্বী মঞ্জুলিকাকে কেমন দেখাবে সেই ছবি মনে এংকে নিয়ে চিত্র পরিচালক ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত হয়ে উঠছেন।

চিত্র পরিচালক ধুবন্ধর স্বপ্ন দেখতে থাকুন, আমরা এটি অবসরে আর একটু এগিয়ে যাই—

ঘনশ্যাম দত্ত বেলেঘাটা অঞ্চলের নামকরা ধনী।

দিপত্নীক বাটে তবে প্রচুর টাকার মালিক।

বহুকাল থেকে গোপনে মনোমত পাত্রীর সন্ধান করছিলেন।

তার জীবনের একমাত্র কামনা, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় চক্ষু মুদ্রে আল-
বোলা টানবেন আর স্ত্রী তার পাশে বসে গান শোনাবেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ঠাটা করে বলেন, তা হলে শোবাব ঘরে একটি
দামী রেডিও সেট রাখো না কেন ?

—উহ ! উত্তর করেন ঘনশ্যাম দত্ত। শুধু গান শুনলেই ত
হবে না। চুলের গন্ধ আর সাড়ীর খস্ খস্ আওয়াজও মাঝে মাঝে
পাওয়া চাই। তাহলেই না অন্তরী তামাকেব ধোঁয়া মনে আমেজ
আনবে।

একটি গানের আসরে সম্প্রতি মঞ্জলিকাকে দেখেছেন দত্ত মশাই।
চক্ষু পবিত্র হয়েছে দর্শনে এবং নর্মে সুখা ঢেলেছে কণ্ঠের-সঙ্গীত।
সেইজন্মে লোক ল'গিয়ে তিনি মেয়েটির ঠিকানাও সংগ্রহ করেছেন।
পালটি ঘর—কোন কিছুরেই আটকাবে না।

নায়েবকে ডেকে চুপি চুপি বলেন, সম্বন্ধ উত্থাপন করে আজই
একটা চিঠি লিখে দিন।

নায়েব ঘাড় কাত করে উত্তর দিলেন, যে আজ্ঞে—

ঘনশ্যাম দত্ত একটা হাই তুলে আবার বলেন, হ্যা, পুনশ্চ দিয়ে
লিখে দিন যে, বব পণের জন্ম আটকাবে না। গা-ভবা গয়না
দিয়ে সাজিয়ে আমরা কনে ঘরে তুলবো—

নায়েব বিগলিত হয়ে বলেন, যথার্থ।

আড় চোখে নায়েবের দিকে একবার তাকিয়ে স্বরণ কবিয়ে
দিলেন, চিঠিতে টিকিট আঁটতে ভুলবেন না যেন ! আপনার যে
ভুলো মন !

নায়েব হাত কচলে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে না ! ছজুরের এত

দিন পর যখন স্মৃতি হয়েছে তখন প্রজাপতি স্বয়ং আমার সহায়
হবেন ।

*

*

পরদিন সকালবেলাকার দৈনিক কাগজগুলিতে এই সংবাদটি
অনেকেরই চোখে পড়ল—

বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী হরলাল চৌখানী বাঙলা দেশের সুকণ্ঠী
তরুণী গায়িকা মঞ্জুলিকা মিত্রকে রেজেন্সী মতে বিবাহ করিয়া গত
কল্যই রাত্রিতে মধুচন্দ্রিমা যাপনার্থ সুইজারল্যান্ড যাত্রা করিয়াছেন ।
এই নব বিবাহিত দম্পতি বিদেশে থাকাকালে চলচ্চিত্র সম্পর্কে
বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে ।
এই আশুঃপ্রাদেশিক বিবাহে আমরা স্বস্তি-বচন উচ্চারণ করি ।
নব দম্পতির জীবন-পথ কুসুমাস্তীর্ণ হউক ।



কথাটা শুনে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি।
বিশ্বাস না করতে পারলে অবশ্য নিজেকে কোনো মতেই দোষ
দেয়া যায় না।

কেননা—কে কবে ভেবেছিল যে, আমাদের শঙ্কর সাজ হ্যাং
'বুদ্ধঃ শরণং গচ্ছামি' উচ্চারণ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবে।

অবশ্য জীবতি'সা না করাটা ভালো কাজ, মতং কাজ। এ রকম
উচ্চাদর্শ সবাইকার মেনে চলা উচিত। কিন্তু তাই বলে আমাদের

দলেব 'ভেটার্ণ' মাংসাশী শঙ্কর সাহু দরবিগলিত নেত্রে একেবারে
স্বয়ং বুদ্ধদেবকে আলিঙ্গন কবে বসবে একথা সুস্থদেহে কল্পনা করাও
শক্ত ।

এককালে “মডার্ণ-বেঙ্গল” শিক্ষিতা ও আধুনিকা ভাষা লাভের
জন্ম রাতাবাতি পিতৃদেবের সঙ্গে কলহ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করত !
নগদ লাভের লোভে এরকম একটা অসমসাহসের কাজ করা
কিছুই নয়, যখন তার পেছনে অধিক রাজহু না থাকুক, সুন্দরী
রাজকন্যা লুকিয়ে আছে । কিন্তু তাই বলে একেবারে নিরিমিষ
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ! পালি ভাষার মতোই বৌদ্ধ-ধর্ম ত এই
তানাতানির যুগে একেবারে প্রাণহীন শবদেহের মতোই পড়ে আছে
বলতে হবে ।

আমাদের দলেব চিরঞ্জীবের শোকটা দেখছি সব চাইতে
বেশী উথলে উঠেছে । সে শুধু কাঁদতে বাকি রাখলে ।

চোখ-মুখ যতদূর সম্ভব বিষন্ন কবে বল্ল, আরে ভাই...মাসে
একটা কবে ফিষ্ট হয় আমাদের...তাতে অমন সুন্দর 'ফাউলকারী'
কেউ রাঁধতে পারে না । শঙ্কর সাহু যদি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল
তবে 'ফিষ্ট' কথাটার আর কোনো মানে থাকে ! তোমরা যে
কেউ রান্না করতে যাবে—'ফিষ্ট'টা 'ফাষ্ট' হয়ে লাড়াবে ! নাঃ,
এইবার দেখছি তোদের ক্লাবের সদস্যপদ ছেড়ে দিতে হবে ।

আমি এল্লাম, চিরঞ্জীব, এত হা-হুতাশ আর অশ্রুপাত করে
লাভ কি ? আমরা শুধু উড়ো খবর পেয়েছি বৈ ত নয় ! চল,
না হয় একবার সরাসরি গিয়ে তদন্ত কবে আসা যাক্ ।

চিরঞ্জীব জবাব দিলে, সেই ভালো ।

ছ'জনে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম ।

অকালে ঝির-ঝির করে বাদল নেমেছে । আকাশটা থমথমে...
ঠিক আমাদের মনের মতোই মেঘলা আর অন্ধকার ।

শঙ্করের বাসায় পৌঁছতে আমবা প্রায় ভিজে উঠলাম । শঙ্কর
বাইরের ঘরে বসে বৌদ্ধ গ্রন্থ পড়ছিল ; আমাদের দেখতে পেয়ে
যেন হাতে স্বর্গ খুঁজে পেলো । বলল, এই যে ভূপতি... চিরঞ্জীবও
আছে দেখছি, —এসো—এসো ।

চিরঞ্জীব চিবকালের অভ্যাস বশে বলতে যাচ্ছিল—চা আর
মাম্লেট ...কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কথা স্মরণ করে চা আর 'মাম্' পরিত্যক্ত
উচ্চারণ করেই চেপে গেল ।

চিরঞ্জীবের কথা শুনে শঙ্কর এমন করুণ-নেত্রে তাকালো যে,
আমাদেরই কান্না পেতে লাগলো ।

শঙ্কর বলল ভাল হয়ে বোস তোরা—! মাম্লেটও পাবি,
তোদের পক্ষে বাধা নেই । তোরা ত আর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিস্
নি, আমি এক্ষুণি ভেতরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

চিরঞ্জীব আমাব কানে কানে বলল, নিশ্চিন্তু হওয়া গেল ।
বৌদি তাহলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেনি, আমাদের মতো পাণ্ডাদের
দলেই আছে ।

আমি শুধু বললাম, হ্যাঁ ! আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি
ভাবে কথা শুরু করা যায় ।

শঙ্কর নিজেই সেই অস্বাভাবিক তাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে
দিয়ে শুরু করলেন ;

বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যাবেলা । হাতে কোনো কাজ ছিল না ।

আপন মনে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মনে মনে বাসনা ছিল সন্ধ্যার সুখে ‘দেলথাম’ কেবিনে ঢকে ফাউল কাটলেটে উদর পূর্ত্তী করে ফিরে আসবো।

হঠাৎ চোখে পড়ল বিজ্ঞপ্তি। বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে জন-সভা। এক বিখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ সাবগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করবেন।

মনে কৌতূহল জাগল। সভায় ঢকে পড়লাম। বৌদ্ধ শ্রমণ তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, “জীব হিংসাব কোনো প্রয়োজন নেই। যখনি কোনো জীব হিংসার প্রবৃত্তি আপনার মনে জাগবে—মনে-মনে কল্পনা করবেন, এই নিরীহ জীবটি আপনার কোনো পরিচিত লোক, কিংবা কোনো-না-কোনো জন্মের আত্মীয়। তা হলেই হিংসা আপনার মন থেকে দূরে চলে যাবে। এক অনাবিল আনন্দে আপনার চিত্ত ভরে উঠবে।”

কথাটি ভারী মনে লাগল। আস্তে আস্তে সভাগৃহ ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ফাউল কাটলেটের তৃষ্ণা কখন যে মন থেকে দূরে চলে গেছে বুঝতেও পারিনি।

তোমরা ত জানো, প্রতাহ নিজের হাতে বাজার করা আমার চিরকালের সখ।

পরের দিন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! রুই মাছের একটা মাথা দর করতে গেছি। বৌদ্ধ শ্রমণের কথা কানে ভেসে এলো! সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি রুই মাছের মাথার পেছনে আমাদের পণ্ডিত মশায়ের টেকো মাথা উকি দিচ্ছে। তোমরাই বলো, তখন কি করে সেই রুই মাছের মাথা কিনে নিয়ে আসি—?

ভাবলাম ছুতোৰ ছাই। একটা মূৰগী কিনে নিয়ে যাঈ !
অনেক দিন 'ফাউল' চেখে দেখা হয় না ! যেই একটা মনোমত
মোরগের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি অমনি তার পেছন থেকে ভেসে



উঠল আমাদের পুরো-
হিত মহাশয়ের ছবি।
সেই লম্বা-লম্বা চুল
ঘাড়ের দিকে, নাকটা
ছুঁচলো। রাগ কবে
বাজাব থেকে বেরিয়ে
আসতে এক রাম-
ছাগলের সামনে পড়ে
গে লা ম। লোভ
পড়েছিল কিনা খেয়াল
নেই, কিন্তু দেখি
আমাদের পাড়া ব

জগমোহন তার ছাগলে দাড়ি নিয়ে—তার পেছনে উকি
দিচ্ছেন !

ভগৎটাই একেবারে নিবিম্বিত হয়ে উঠল। সেই থেকে যেই
কোনো গল্‌দা চিংড়ির দিকে কিম্বা পুঁটি মাছের পানে নজর
দিয়েছি তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠেছে—আমাদের মোটকা গ্যালিকা কিম্বা
ক্যাংলা সম্বন্ধী। তোমরাই বলো, এরপর আশ ক করে আমার
আমিবে রুচি থাকে ? বলে বিশ্বাস করবিনি তোবা, তারপর
দিনই গিয়ে বুদ্ধ-শ্রমণের ঠিকানা সংগ্রহ করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে

বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিলুম। সেই দিন থেকে শুধু কাচ-কলা-
ভাতে খেয়ে আছি। তোদের বৌদ্ধিত রাগ করে আমার সঙ্গে
বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছে !

বৌদ্ধি কিছু অন্যায় করেছে বলে মনে হল না ; কেননা
শঙ্করের কাহিনী শুনে আমাদের দুই বন্ধুও বাক্রোধ হয়ে গেল ।



[প্রতি বছর আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার অব্যবহিত পরে নানারূপ হাঙ্গামার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জয়ী ও বিজিত দুই দলেরই সমর্থক দল থাকে। বিভিন্ন দলের হার নিয়েই যে এই ধবণেব ঘটনা ঘটে থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। যারা শুধু খেলাকেই ভালবাসেন কোন দল বিশেষের সমর্থক বা অন্ধ-ভক্ত নন, সেই সব পাঠক-পাঠিকা আশা করি নীব পরিত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারবেন। কল্পনা করা যেতে পারে যে, এই বছর ফাইনাল খেলার পর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে। কাউকে আঘাত করবার জগ্গে নয়, পরস্পর নিছক রস-সৃষ্টির জগ্গেই কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হল।]

[স্থান—কুমোরটুলির একটি অঞ্চল। সন্ধ্যা সবে উৎরে গেছে। একটি ফ্যাটে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করেন। কর্তা পূর্ববঙ্গের; গিন্নির বাড়ী কলকাতায়। বাড়ীর গৃহিণী সবে লক্ষ্মীর প্রদীপ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় দরজায় কর্তার হাঁকডাক শোনা গেল।]

কর্তা ॥ ও গিন্নি, শীগ্‌গীর দরজাটা খুল্যা দাও, আর কতক্ষণ দোর গোড়ায় খারাইয়া থাকুম ?

গিন্নি ॥ কি জ্বালাতন ! মা লক্ষ্মীর কাছে সন্ধ্যাবেলা যে একটু শাখ বাজাবো—তারও যো নেই ! একটু দাঁড়াও বাপু যাচ্ছি !

[দরজা খুলে দিয়েই আতকে উঠলো ।]

গিন্নি ॥ কি সর্বনাশ ! এত বড় একটা ইলিশ মাছ দিয়ে আমার কোন্‌ শ্রাদ্ধটা হবে শুনি ?

কর্তা ॥ আরে, বুঝ্‌তাছ না গিন্নি ! আইজকা ইস্টব্যঙ্গল জিত্‌ছে, বেশ কইর্যা কাঁচা মরিচ দিয়া ইল্‌সা মাছের পাতুরী করো, খাইয়া প্রাণডা ঠাণ্ডা করি ।

গিন্নি ॥ বটে ! তোমাদের ইস্টবেঙ্গল জিতেছে আর আমি ইলিশ মাছের পিণ্ডি চটকাবো ? তেমন মেয়ে আমায় পাওনি !

কর্তা ॥ আ-হা-হা ! ইল্‌সা মাছের পিণ্ডি চটকাইব্যা ক্যান্‌ ? আইজ ত' আনন্দ করণের দিন ! প্যাড্‌ ভইর্যা খাইয়া গলা খুইল্যা গান গামু—

গিন্নি ॥ হুঁ ! পেট ভরে খেয়ে গলা খুলে গান গাবো ? হ্যাঁ, জিততো যদি আমাদের মোহনবাগান, তবে আমি নিজের হাতে চিংড়ি মাছের মালাইকারী করে খাওয়াতাম—

কর্তা ॥ তুমি কও কি গিনি ? কাঁচা মরিচের লগে এই তরতাজা ইলসা মাছ...অ্যাকেবারে অমর্ত ! খাইয়া দেখনা আইজ ।

গিনি ॥ এই রইল তোমার ঘর-সংসার আর রইল তোমার ইলিস মাছ ! আমি বাপের বাড়ী চল্লাম—

কর্তা ॥ আরে গিনি, শুইয়া যাও, অবুঝ হয়োনা লক্ষ্মীটি—
আমারে এমন কইয়া অনাথ কইয়া যাইওনা তুমি —

গিনি ॥ পেছু ডাকলে আমি গলায় দড়ি দেবো, তখন পুলিশ এসে তোমার হাতেই হাতকড়া পরাবে, হুঁ ।

কর্তা ॥ হায়-হায়-হায় ! আমার এমন ইলসা মাছটা অ্যাকে-
বারে অদানে-অব্রাহ্মণে গেল !

*

*

*

*

স্থান—চিত্রার সামনের ফুটপাথ । একটি তরুণী ক্রমাগত পাইচারী করছে
আর ঘন ঘন হাত ঘড়ি দেখছে । রাত্রে শো এখনি শুরু হবে । বেল বেজে
উঠেছে । দর্শকেরা ভীড় করে ভিতরে ঢুকছে । মেয়েটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ।
এমন সময় দেখা গেল, উল্কাখুস্কো বেগে একটি তরুণ সেই দিকে আসছে]

সন্ধ্যামালতী ॥ এ কি সুমন, তুমি এত দেরী করলে কেন ?
শো বোধ হয় এতক্ষণ শুরু হয়ে গেল !

সুমন ॥ সন্ধ্যা, আমি এফুনি হাওড়া স্টেশনে রওনা হচ্ছি—

সন্ধ্যামালতী ॥ হাওড়া ? কেউ আসবে বুঝি ?

সুমন ॥ না সন্ধ্যা, আমি বিবাগী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি ।
সন্ন্যাসী হবো বলেই ঠিক করেছি—

সন্ধ্যামালতী ॥ (কৌতুক করে) কিন্তু তোমার গেরুয়া কৈ ?
হরিদ্বার যাবে বুঝি ?

সুমন। না সন্ধ্যা, ঠাট্টা নয়। মোহনবাগান হেরে গেছে। জীবন আমার একেবারে ঘসা আধলার মতো হয়ে গেছে। সংসারে আর আমি থাকবো না।

সন্ধ্যামালতী॥ কিন্তু আমাদের বিয়ে?

সুমন॥ (আংকে উঠে) অ্যা! বিয়ে! তুমি বলছ কি মালতী? শোনো সন্ধ্যামালতী, তুমি আমায় ভুলে যাও। ঘর-বাঁধা আর আমার হবে না। এই নাও সিনেমার টিকিট। ছু'খানাই আছে। যদি সম্ভব হয় সিনেমা দেখতে দেখতে একটি বান্ধব জুটিয়ে নিও। আমি ফুরিয়ে গেছি!

সন্ধ্যামালতী॥ সুমন, এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে বলত! আমি এলাম পাকিস্তান থেকে—একেবারে আশ্রয়হীনা!.....

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল) তোমার সঙ্গে পরিচয় হল গঙ্গার ঘাটে। আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম...তুমি আমায় বাঁচালে...আশ্বাস দিলে! একটি চাকরীও জুটিয়ে দিলে তুমি। নীড় রচনার স্বপ্ন তুমি জাগিয়ে দিলে আমার অন্তরে! আজ বলছ কিনা তুমি বিবাহী হবে!

সুমন॥ ঠিক কথাই বলেছি সন্ধ্যামালতী! আজ আর আমার চোখে মায়া-অঞ্জন নেই! জীবন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। তোমার জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত হ'য়ে ঝুঁক এই কামনা জানাই।

সন্ধ্যামালতী॥ কি করে তবে আমি বাঁচবো?

সুমন॥ হতাশ হয়ো না সন্ধ্যা, পাথেয় দিয়ে গেলাম তোমার হাতে। সিনেমার কথা শুনলে আজকের দিনে যে কোনো তরুণ তোমার সঙ্গে হতে রাজি হবে...চাই কি জীবন-সঙ্গী পর্যন্ত। আমার

তুমি ছেড়ে দাও সন্ধ্যা ! ওই সিনেমা টিকিটের দৌলতে তোমার
বান্ধব জুটুক, এই কামনা জানাই।

[স্মমন মেলোড্রামার নায়কের মতো প্রস্থান করল, আর সন্ধ্যামালতী দুখানি
সিনেমার টিকিট হাতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কোন্ তরুণ টিকিট
না পেয়ে হতাশ হয়ে সর্বস্বরার মতো দাঁড়িয়ে আছে !]

*

*

*

*

[কাল—সকাল। একটি বাড়ীব সম্মুখভাগ। একটি ছেলে এসে ক্রমাগত
কড়া নাড়তে লাগলো। খানিকটা বাদে আর একটা ছেলে এসে দরজা
খুলে দিলে।]

গোবর্ধন ॥ কিরে ক্যাবলা, এমন বিহানবেলা কড়া নাইড়ত্যাছিস
ক্যান ? কাইল রাইতে ঘুমাস নাই ?

ক্যাবলা ॥ কাল রাত্তিরে ঘুমিয়েছি কিনা সে খবর দিয়ে তোর
কি কাজ ? আমার লাটিম আর ছবির বই সব ফিরিয়ে দে।

গোবর্ধন ॥ আরে ! এত চইটত্যাছিস ক্যান ? তোর কি
অইচে তাই ক' দেহি—

ক্যাবলা ॥ আবার জিজ্ঞেস্ করছিস ? লজ্জা করে না ?

গোবর্ধন ॥ লজ্জা ? লজ্জা কিসের রে ? তুই যে আমারে
হকচকাইয়া দিত্যাছিস ! খুইলা ক'—শুনি—

ক্যাবলা ॥ আবার ত্রাকা সাজা হচ্ছে ! তোদের ইষ্টবেঙ্গল
কেন ফাইনালে জিতল শুনি ?

গোবর্ধন ॥ আরে তাতে কি অইচে রে ? ও খেলার কথা ছাইর্যা
দে—

ক্যাবলা ॥ হুঁ ! ছেড়ে দেবো। ইষ্টবেঙ্গল তোদের কি আর

আছে? সে ত পাকিস্তান হ'য়ে গেছে! তবু কেন তোরা...
এ তোদের ভারী অত্মায়।

গোবর্ধন ॥ আরে ভাই, খেলায় হার-জিত আছেই। তার
লাইগ্যা এত কাইজ্যা কিসের? চল ভাই, লাট্টু খেলি গ্যা—

ক্যাবলা ॥ না—না! তোর সঙ্গে আর আমি খেলব না।
তোরা এসে কোলকাতায় জায়গা পেয়েছিস...আবার ইষ্টবেঙ্গল
জিতবে! এ তোদের কেমন বিবেচনা শুনি? দে, আমার লাট্টু
ছবির বই সব ফিরিয়ে দে। তোর সঙ্গে আমার আড়ি—

গোবর্ধন ॥ আচ্ছা, ভাই, দিত্যাছি সব ফিরাইয়া—

✻

*

*

✻

[স্থান—একটি ফ্ল্যাট বাড়ি। পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাট। পরস্পরের সঙ্গে খুব
হুত্বতা। একটি বাড়ীর ছেলে লাফাতে লাফাতে আর একটি বাড়ীর বৈঠক-
খানায় এসে হাজির হল। ছেলেটির নাম চঞ্চল। বৈঠকখানায় বসে এক ভদ্রলোক
খবরে কাগজ পড়ছিলেন।]

চঞ্চল ॥ কাকাবাবু, ও কাকাবাবু—

[কাকাবাবুর মুখে কোনো কথা শোনা গেল না। তিনি নীরবে খবরের কাগজ
পড়তে লাগলেন]

চঞ্চল ॥ কাকাবাবু, আমার ডাক শুইন্ত্যাছ না?

কাকাবাবু ॥ (গম্ভীরভাবে) কি বলবি, বল!

চঞ্চল ॥ আইজ যে আমার জন্মদিন। তোমাগো সকলের
নিমন্তুন আমাগো বাড়ী—বাবা কইচেন।

কাকাবাবু ॥ হুঁ!

চঞ্চল ॥ হুঁ কি কাকাবাবু? আমার জন্মদিনে কি দিবা কও?

কাকাবাবু ॥ (হঠাৎ রেগে উঠে) হুঁ। চালাকির আর যা়গা পাওনি! কাল ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে আর আজ তোর জন্মদিন! ওসব চাল আমরা বেশ বুঝি!

চঞ্চল ॥ কাকাবাবু, তুমি কও কি? আইজ সত্যি আমার জন্মদিন। মা মিঠাই তৈরী কইর্ত্যাচে। তোমাগো খাইতেই অইবো।

কাকাবাবু ॥ হুঁ! ফাঁকি দিয়ে আমাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে দেওয়া। কিন্তু ও চালে আমরা ভুলছিনে! বলে দিস, তোদের বাড়ীর সবাইকে—আমরা কেউ ওখানে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করবো না। হুঁ বাব্বা! আমার এক কথা—একেবারে যাকে বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

*

*

*

*

[স্থান—একটি ব্যবসায়ী অফিস। মালিক পূর্ববঙ্গের লোক। আজ খুব সকাল সকাল অফিসে এসেছেন। কর্মচারীরা ভয়ে তটস্থ। না জানি, কার কাজে কোন ক্রটি বেরিয়ে পড়ে!]

মালিক ॥ আইজ সকাল সকাল অফিসে আইছি বইল্যা আপনারা বুঝি খুব ভয় পাইচেন? না না—শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। আপনাগো আইজ একটা সংবাদ জানানু।

১ম কর্মচারী ॥ আঞ্জে বলুন, আমরা ত' অফিসের কাজে জান-প্রাণ দিয়ে খাটিছি—

২য় কর্মচারী ॥ আঞ্জে হ্যাঁ, ছুটির পরও হুঁ ঘন্টা থেকে এরিয়ার সেরে রাখি—

৩য় কর্মচারী ॥ খাতা-পত্রে কোনো খুঁত পাবেন না আমাদের—

৪র্থ কর্মচারী ॥ ইনকাম ট্যান্স ফাঁকি দেবার জন্তে দু'টো খাতা তৈরী করে ফেলেছি, স্মার—

মালিক ॥ বেশ ! বেশ ! আপনাগো কথা শুইয়া ভারী খুসী হইলাম । অফিসের কাজকর্ম তা আইলে বেশ ভালই চইলতাছে !

বড়বাবু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ ! খাতা-পত্রে আপনি কোনো ত্রুটি পাবেন না— ! ওরে কে আছিস,—লেজার বইগুলো—

মালিক ॥ থাইক থাইক ! তা অইলে আমার কথাডা আপনারা শোনেন,—যে জন্তে এত সকালে আমি অফিসে চইল্যা আইচি—

বড় বাবু ॥ আজ্ঞে বলুন স্মার । ব্যবসাতে খুব লাভ হয়েছি বুঝি ?

মালিক ॥ না না, খুব যে বেশী লাভ অইচে তা না । তবে কি জানেন, ইষ্টব্যঙ্গল জিতেছে কাইল । আমি ঠিক করছি—সকলরে এক মাসের পূজা বোনাস দিমু—আপনারা সব ভালো কইর্যা মন দিয়া কাম কইরা যান— (প্রস্থান)

বড়বাবু ॥ হুঁ ! ব্যাটার হাত দিয়ে একটি পয়সা গলে না ! একদিন কামাই করলে মাইনে কেটে নেয়....একেবারে দাতাকর্ণ হ'য়ে উঠেছে । ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে তাই হয়েছে কি শুনি ?

সবাই ॥ আজ্ঞে ঠিকই ত ! তবে বোনাসটা...বুঝলেন না ! বর্বরস্বাধনক্ষয়ম...হা—হা—হা !

* * * *

[স্থান—অপর একটি অফিস । মালিক পশ্চিমবঙ্গের লোক । মুখ গভীর করে খাস্ কামরায় বসে আছেন । এমন সময় একটি বেয়ারা এসে ঢুকলো]

বেয়ারা ॥ আইজ্ঞা কোর্তা—

[কোনো সাড়া নেই]

বেয়াবা ॥ কৰ্তা, আমাৰ পৰিবাৰেৰ বড় ব্যামো—

[কৰ্তা নীৰব]

বেয়াৰা ॥ আইজ্ঞা কোৰ্তা—

মালিক ॥ আমি কি কালা ? কি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ কৰছিস—
কানৈৰ কাছে এসে ?

বেয়াৰা ॥ কোৰ্তা, আমাৰে বাঁচান...পৰিবাৰেৰ এখন-তখন
অবস্থা ! দোহাই কোৰ্তা, আপনৈৰ পায়ে ধৰি—

মালিক ॥ এখন তখন অবস্থা তা আমি কি কৰবো ? আমি কি
ধন্থন্তরী ? কানে তারক-ব্রহ্ম নাম শোনাতে থাক ।

বেয়াৰা ॥ আইজ্ঞা কোৰ্তা, আপনি কন কি ? অযুদ-পন্তর ত
খাওয়ান লাইগুবো । বেশী না, আমাৰে পাঁচডা টাকা ছান...

মালিক ॥ ছাথ, এটা অফিস । দান-খয়রাতিৰ জায়গা নয় ।
মিছে বিরক্ত কৰিসনে আনায়—কাজে যা—

বেয়াৰা ॥ কিন্তু কোৰ্তা, আমাৰ পৰিবাৰ—

মালিক ॥ চুলোয় যাক তোৰ পৰিবাৰ ! আজ একটি পয়সা
কেউ অ্যাড্ ভান্স পাবে না ! আজ আমাৰ মন-মেজাজ ভালো নেই ।

বেয়াৰা ॥ একবার ভাইবা ছাখেন কৰ্তা—আমাৰ বিপদডা—

মালিক ॥ তোৰ বিপদ তাতে আমাৰ কি রে ? কাল যে
আমাৰ অমন বিপদ হোল—কেউ এগিয়ে এলো ?

বেয়াৰা ॥ আইজ্ঞা, আপনাৰ বিপদ কোৰ্তা ?

মালিক ॥ হ্যা—হ্যা । আমাৰ বিপদ ! কাল মোহনবাগান
হেৰে যায়নি ! যা যা—আমাৰ স্তম্ভুথ থেকে সরে যা, নইলে
চাকরী থাকবে না বলে দিচ্ছি !

(স্থান—বালিগঞ্জের একটি অতি আধুনিক হালক্যাসনের বাড়ী । ঝি চাকর থেকে শুরু করে বাড়ীর সবাই তটস্থ । ব্যাপার আর কিছুই নয় । বাড়ীর একমাত্র মেয়েকে বরের বকুবা দেখতে এসেছে ।]

১ম বন্ধু ॥ বেশ ত ! রবীন্দ্রনাথের গান না জানেন—আধুনিক গান একটা আমাদের শুনিয়ে দিন—

[কনে চুপচাপ]

২য় বন্ধু ॥ আমরা হিন্দি গান শুনতেও ভালবাসি—(স্বর করে)
লারে লাঙ্গা—লারে লাঙ্গা—

৩য় বন্ধু ॥ তুই থাম দেখি । আমরা শুনতে চাই মিস দত্তের গান । আচ্ছা, একটি ভাটিয়ালী গানই ধরুন না—

৪র্থ বন্ধু ॥ নিদেন পক্ষে একটা রামপ্রসাদী—

মা আমায় ঘুরাবি কতো—

কল্লুর চোখ ঢাকা বলদের মতো—

[কনে তবু নীরব রইল]

৫ম বন্ধু ॥ আচ্ছা আমরা শুনেছিলাম, মিস দত্ত খুব সোসিয়্যাল ।

৬ষ্ঠ বন্ধু ॥ আর একথাও জানতে পেরেছি যে, আমাদের ভাগ্যবান বন্ধুটি মিস দত্তের গানই শুনেই নাকি—

গৃহকর্তা ॥ অজ্ঞে আপনারা ঠিক কথাই শুনেছেন । অপূর্ব আমার মেয়ের গলা । গীত-সাগরে গান গেয়ে গীত-কুহেলিকা উপাধি পেয়েছে । গাও ত' মা মিনি, একটি আধুনিক গান গেয়ে শুনিয়ে দাও ত !

কনে ॥ না বাবা, আমায় অনুরোধ করোনা, আজ আমি কোনো গান গাইতে পারবো না —

১ম বন্ধু ॥ টন্সিল বেড়েছে বুঝি ? তা, আমি ত' ডাক্তার,
ভালো ওষুধ 'প্রেস্ক্রাইব' করে দেবোখন।

২য় বন্ধু ॥ কাল কোনো সভায় আপনার বক্তৃতা ছিল বুঝি ?

৩য় বন্ধু ॥ তা একটু আদা নুন খেয়ে—

কনে ॥ ফর হেভেল সেক্ ! আজ আপনারা আমায় রেহাই দিন !

গৃহকর্তা ॥ না, না, এত ভাল গাইতে পারো তুমি ! ওঁরা

কি মনে করেছেন
বলো ত !

কনে ॥ (কৈঁদে ফেলে)
মোহনবাগান ' গোল
খেলো, আর তুমি
আমায় গান গাইতে
বলছ বাবা। এর
চাইতে ট্রাজেডি আর
কি হতে পারে ?

[কনে একেবারে কান্নায়
ভেঙে পড়ল]



* * *
[স্থান—একটি বালিকা বিদ্যালয়। টিফিনের সময় মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে
গাছতলায় সমবেত হয়েছে]

মঞ্জুলা ॥ চল হেনা, আমরা একসঙ্গে বসে টিফিন খাই—

হেনা ॥ কেন, আজ এত আদর কেন শুনি ?

মঞ্জুলা ॥ আদর আর কি ভাই ? মা ঘরে মিষ্টি তৈরী করে
দিয়েছে—তাকে না দিয়ে কি আমার খেতে ইচ্ছে করে ?

হেনা ॥ থাক অত খাতিরে আর কাজ নেই । ও মিষ্টি আমার কাছে তেতো লাগবে । তোর বাড়ীর মিষ্টি তুই-ই খানা !

মঞ্জুলা ॥ কেন রে হেনা ? এ কথা বলছিস কেন ? আমি কি দোষ করলাম, কিছু বুঝতে পারছিনে ত !

হেনা ॥ ইস্ ! ভাজা মাছটি উন্টে খেতে জানে না যেন ।

মঞ্জু ॥ কি বলতে চাস তুই ?

হেনা ॥ আমি এই কথাই বলতে চাই যে, ইষ্টবেঙ্গল জিতেছে বলেই তুই আমায় এত আদর করে মিষ্টি খেতে বলছিস ! যা—খাবো না আমি তোর মিষ্টি ! বাঙাল কোথাকার...

মঞ্জুলা ॥ হুঁ ! আমি ত বাঙাল ! কিন্তু তোরা ত' ঘটি...

হেনা ॥ (কোমরে সাড়ি জড়িয়ে) ঘটি ! তাতে হয়েছে কি, শুনি ! আয় না দেখি—(মঞ্জুলির বেগী টেনে ধরল)

মঞ্জুলা ॥ বটে । আমার সঙ্গে জোরে পারবি তুই ? আমি সাঁতরে পদ্মা পার হয়েছে—(ঘূষি মারলে হেনার ঠোঁটে)

হেনা ॥ বাঙ্গাল কোথাকার—

মঞ্জুলা ॥ ঘটি কোথাকার—

[দু'জনের চীৎকার শুনে অগাধ মেয়েরা ছুটে এলো । তারপর মেয়েরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেল । এ ধরলো ওর বেগী টেনে ; ও ধরলো তার আঁচল আঁকড়ে । তারপর কামড়া-কামড়ি, আঁচড়া-আঁচড়ি, চীৎকার, শেষ পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কান্না...! এতগুলি মেয়ের কান্না শুনে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বেরিয়ে এলেন । তারপর দুই চোখ কপালে তুলে চীৎকার করতে লাগলেন ।]

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ॥ এই দারোয়ান, রামসিং, পুলিশ, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, সি-এস-পি-সি-এ... জলদি...

[যবনিকা]



স্বাধীনতা-দিবস আর শ্রীঅববিন্দ-মহোৎসব একযোগে ।
যাকে বলে একেবারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ ।
গড়ের মাঠে তিল ধারণের ঠাঁই নেই ।
যেমন ছেলে—তেমন মেয়ে ।
ভাগাভাগি করে বিরাট এক ভৌলদণ্ডে বসিয়ে দিলে বোধ করি
সমানই হবে ।

উৎসব ছিল মোহনবাগান-গ্রাউণ্ডে । খেলাধুলা আর ব্যায়ামের
কসরৎ ।

অল্পাধিক যখন চলছিল তখন রাশি রাশি মাথা দেখা যাচ্ছিল বটে,
কিন্তু সব স্থির হয়ে বাগানের মতো বেড়া দেয়া অবস্থায়
আটকা ছিল ।

বাণ্ড বাজিয়ে যখন উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হল—
তখনই বিপদ !

পিল্ পিল্ করে পিঁপড়ের সাবির মতো কে যে কোন দিকে
বেরিয়ে এলো ঠিক ঠাহর করা গেল না ।

• লোকের দারুণ চাপে গুণধর বেশ খানিকটা পথ শূন্যে-শূন্যেই
যেন উড়ে এলো । তাবপর কোনো রকম নোটিশ না দিয়েই
একেবারে থপাস্ করে—পপাত ধবণী-তলে—

গুণধর এইবার হৃদয়ঙ্গম করলে যে, নিজের পায়ের ওপর
ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে । পরের কাঁধে খানিকক্ষণ চলে বটে, কিন্তু
সেই কাঁধ যখন বদল হয়—তখন দস্তুরমতো জানিয়ে দিয়ে যায়
যে, তারা এইবার সরে গেল ।

উপায় নেই, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতেই হবে । কেন না,
কবিই সংপরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন—

“যে মাটিতে পড়ে লোক

ওঠে তাই ধরে !”

উঠে দাঁড়িয়েই ঘাড় ফিরিয়ে পাঞ্জাবীর পেছন দিকে একবার
চোখ বুলিয়ে নিলে ।

যা আশঙ্কা করেছিল ঠিক তাই ।

পাঞ্জাবীর ঠিক পেছনটায় কাদার একটা ছাপ পড়ে গেছে। মাঝখানে খানিকটা ইল্শে গুঁড়ি রুষ্টি হয়েছিল, তাতেই জমি ভিজে বেশ মোলায়েম হয়ে আছে, মানে—ছাপ দেবার পক্ষে তৈরী হয়েই আছে, শুধু একটা আধার পেলেই হল।

এর জন্তে মন খারাপ করে লাভ নেই। শরীর থাকলেই ব্যাধি হয়, জামা থাকলেই কাদার দাগ লাগে। এসব ব্যাপারে যে মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না—সে একটি আস্ত নিরেট...

গুণধর চরণ-যুগলকে আরো দ্রুত করলে। লোকভর্তী একটা বাস বেশ গদাই-লঙ্করী চালে এসুপ্লানেডে মোড় ঘুরছে। শুধু ভর্তী বলে নিছক ভদ্রতা করে বলা হয়। একেবারে যাকে বলা বাহুড়-ঝোলা।

এইজাতীয় প্যাককরা বাস আর ক'টা তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে—আর সে ফ্যান্ ফ্যান্ করে অনাথ বালকের মতো তাকিয়ে থাকবে, সেকথা ঠিক করে বলা শক্ত !

এদিক ওদিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে কুণ্ঠিত একটা ডাক এলো—শুনছেন—

গুণধর প্রথমটা আদপেই আমল দেয় নি—এরকম 'শুনছেন' ডাক—কত জন কত জনকে ডাকতে পারে—মানে, আহ্বান জানাতে পারে। এসুপ্লানেডের মোড়ে কোনো মেয়ে যে তাকে ডাকতে পারে না—সে বিষয়ে গুণধর একেবারে নিশ্চিত। তাই নিতান্ত কৌতূহলবশেও সে ফিরে তাকায় নি !

কিন্তু না, ডাকটা যে আবার এলো !

ঠিক তার ঘাড়ের কাছে বলেও চলে।

এইবার আর কৌতূহল নয়, কর্তব্যবোধে সে ফিরে তাকাল।

হ্যাঁ, একটি সুশ্রী ও সুবেশা তরুণী তাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে।

তবু ভদ্রতার খাতিরে যে কথা উচ্চারণ করতে হয় গুণধর তাই বলে, আপনি আমায় কিছু বলছেন ?

হ্যাঁ—মেয়েটি এগিয়ে এসে জবাব দিলে। আমার ড্রাইভারকে এইখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, সে হয়ত আমার কথা বুঝতে পারে নি, গাড়ী নিয়ে চলে গেছে,...আপনি ত' আমাদের পাড়াতেই থাকেন—

এতক্ষণ গুণধর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল, এইবার সত্যি বিস্মিত হল। এই তরুণীর সঙ্গে একপাড়ায় সে বাস করে—সে খবর তরুণীটির অজানা নয়, অথচ সে এর বিন্দুবিসর্গও জানে না !

এর চাইতে আশ্চর্যের কথা আর কি হতে পারে !

সে শুধু আম্তা-আম্তা করে ভাঙা-ভাঙা কথায় উত্তর দিলে, আমি—মানে—আপনি—আমাদের পাড়ায় থাকেন ?

মেয়েটি ইতিমধ্যে সঙ্কোচের ভাবটা বেশ কাটিয়ে নিতে পেরেছে। বলে, হ্যাঁ, আপনার বাসার নম্বর সতেরো আর আর আমার হচ্ছে একুশ। মানে আপনাদের বাসা পেরিয়ে যেতে হয়। আর আপনি পড়েন স্কটিসে—আর আমি উইমেন্স কলেজে। এখানেও রোজ ছাড়িয়ে যেতে হয়।

গুণধরের জন্মে যে ১৫ই আগষ্ট তারিখে এত বিস্ময় জমা হয়ে ছিল—বাড়ী থেকে বেরুবার সময় সে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি। সতেরো—একুশ—স্কটিশ আর উইমেন্স কলেজ ! অথচ সে এতদিন কিছু টের পায় নি !

পৃথিবী থেকে চন্দ্র কত লক্ষ কোটি মাইল দূর—তা সে হিসেব করে বলে দিতে পারে ; পারে না শুধু তাদের তালপুকুর লেনের সতেরো থেকে একুশ নম্বর বাড়ীটা কতদূর সেই কথা বলতে !

গুণধর তখন ভাবছে—মেয়েটি তার নামটাও জানে না কি ?

নাঃ, সেটা সম্ভবপর নয় ।

একট্রামে হয়ত ওরা হামেশা কলেজে যায়—তাই তরুণী ওকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে থাকবে। কিন্তু সচরাচর এই আগ্রহটা ত' উল্টো দিক থেকেই দেখা যায় !

আর বেশীক্ষণ চুপচাপ থাকলে—মেয়েটিও হয়ত যেচে আলাপ করবার জন্যে লজ্জা পেতো। তাই সেই দুর্বল মুহূর্তটিকে সহজ করবার জন্যে গুণধর মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকে মাঝে মাঝে ট্রামে দেখেছি বটে !

এইবার তরুণীটি খিল-খিল করে হেসে উঠল ? —না, আমি ট্রামে যাই না ত ! বাড়ীর গাড়ী আছে। হেদোর কাছে আপনি প্রায়ই ট্রাম থেকে নামেন কিম্বা ট্রামে ওঠেন—দেখতে পাই।

গুণধর মনে মনে বললে, মা বসুন্ধরা, দ্বিধা হও। কিন্তু এস্প্রায়নেডের পিচ্ঢালা রাস্তায় শুধু চারিদিকের আলো পড়ে চিক্মিক করতে লাগলো, সেখানে ফাটল ধববার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না !

মেয়েটিই তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করল। বললে, আপনি এখন বাসাতেই ফিরবেন ত' ? আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। মানে, একা একা ট্রামে-বাসে ওঠবার অভ্যেস নেই

ত ! আর মুস্কিল হয়েছে এমন যে, বাড়ীর গাড়ীতে ফিরব বলে ‘পাস’টাও ভুল করে বাড়ীতে ফেলে এসেছি !

গুণধরের মনে-প্রাণে হঠাৎ ‘নাইটের’ বীরত্ব জেগে উঠল। অসহায়া তরুণী, সঙ্গীহীনা—আশ্রয় চাইছে। মধ্য যুগের ইউরোপ হলে এই জগ্গে যে কোন ‘নাইট’ অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বসত ! আর সে কিনা একটা ট্যাক্সির ভাড়া জোটাতে পারবে না ! এর চাইতে জীবন না থাকাই উচিত।

গুণধরের বুক-পকেটে কর্করে দশটাকার একটি নোট তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেছে। এই নোটটি সে লাভ করেছে একটি পাতায় ‘নন্দী জাগরণ’ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে। সম্পাদকের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি ছিল যে, লেখাটি প্রকাশিত হবে একজন শ্রীমতীর নামে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে পাবে নগদ দশটি মুদ্রা।

সেই দশটি মুদ্রা আজ সম্পাদক-বন্ধু তাকে উপঢৌকন দিয়েছেন।

নব-পরিচিতি, সুদর্শনা, তরুণী প্রতিবেশিনীর জগ্গে যদি সে এই স্বাধীনতা লাভের সন্ধ্যায় একটি ট্যাক্সি ভাড়া করবার মনের বল নিজের মধ্যে খুঁজে না পায় তবে স্বাধীনতা পেয়ে তার লাভ হল কি ? তিনশ’ পঁয়ষট্টি দিন ত’ ট্রামে-বাসে ভীড় ঠেলে উঠতেই হবে।

নাঃ, অন্তত একটি সন্ধ্যা সে স্বাধীনতার বিমল আনন্দ উপভোগ করবে।

ভীড় ঠেলে একটি খালি ট্যাক্সি মন্ডর গতিতে এগিয়ে আসছিল। হিটলার যে ভঙ্গীতে আঙুল নাচিয়ে জনগণকে সম্বোধন করতেন ঠিক সেই কায়দায় গুণধর ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আহ্বান করলে, তারপর

শ্মিতহাস্তে তরুণী প্রতিবেশিনীকে বলে, আশুন, আমি বাসায়ই ফিরছি। আপনাকে কি বলে ডাকবো? মিস—

খুলে পড়া খোঁপাটাকে বাঁ হাতে সামলে নিয়ে প্রতিবেশিনী উত্তর করলো, আমার নাম লতিকা সোম। কিন্তু আপনি মিছিমিছি আমার জন্তে হুট করে ট্যাক্সি ডেকে বসলেন...? এ জান্লে আমি আদপেই আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে অনুরোধ করতাম না গুণধরবাবু—

—আপনি আমার নামও জানেন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো গুণধর! তার দেহে আর মনে অপূর্ব একটি শিহরণ!

হয়ত স্বাধীনতার মূহু সমীরণের মন্ত্র প্রভাবই এর একমাত্র কারণ!

জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন মানুষ ভাবে—শ্রাম রাখি কি কুল রাখি।

ট্যাক্সীতে বসে গুণধরের সেই অবস্থাই হ'ল। পার্শ্বে নবপরিচিতি সুন্দরী প্রতিবেশিনী, হাওয়ায় তার অলক-তুল্ছে, কেশ-বেশ থেকে আসছে একটি অনাদ্রাত মিষ্টি গন্ধ। অত্যধিক লোকের ভীড়ে লতিকার মুখে জমেছে রাশি রাশি মুক্তা-বিন্দু! তাকিয়ে দেখবার মতো। কিন্তু প্রাণ ভরে গুণধর সেই সৌন্দর্য অবলোকন করবে সে উপায় নেই! ট্যাক্সী-মিটার কানে ধরে তার চোখ ছুটি ক্রমাগত সেই দিকে আকর্ষণ করছে!

স্বপ্ন আর বাস্তবের এমন সঙ্ঘর্ষের কাহিনী গোৰ্কীও বুঝি তাঁর অমর-সাহিত্যে অঙ্কয় করে রেখে যেতে পারেন নি।

ফলে গুণধরও ট্যাক্সীর গহ্বরে বসে যেমে উঠল, তার জিত

গেল আড়ষ্ট হয়ে ; অনেক ভালো ভালো কথা বৃকে জমে থাকলেও মুখ দিয়ে বেরুতে চাইলো না ।

কিন্তু কথার থৈ ফুটে থাকলো লতিকার মুখে । সে “তৃষাতুর” কাগজে গুণধরের লেখা প্রায়ই পড়ে, তা ছাড়া, পাড়ার নামকরা ছাত্র হিসাবে চেনে অনেক কাল, শুধু সামান্যসামান্য আলাপ নেই— এই যা ! ইতিমধ্যে লতিকা তাকে চায়ের নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত করে বসল ।

কিন্তু মুষ্কিল এই যে, গুণধরের পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই ! একটানা লতিকা আর কতক্ষণ বকে যেতে পারে ?

বৈঠকী গান তখনই জমে—যখন ‘ঠেকা’ হয় মনের মতো । লতিকা গুণধরের পক্ষ থেকে কোনো রকম লাগসই ‘ঠেকা’ না পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আপনার বুদ্ধি অল্প কোথাও যাবার কথা ছিল ? আমার জন্মেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল ? ছি-ছি— আমার অনুরোধ করাই গলায় হয়েছে—!

তখন ভদ্রতার খাতিরেও গুণধরের মৃদু প্রতিবাদ করা উচিত ছিল । কিন্তু দৃষ্টি তখন তার মিটারের দিকে নিবদ্ধ ! তাই ঘাড় না ফিরিয়েই অশ্রমনস্কভাবে বল্লেন, ‘উ—হু’ ।

জবাব শুনে লতিকা যেন সপ্তম স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলো ।

এর প্রত্যুত্তর দিলে লতিকা বাড়ীতে পৌঁছে ।

মিটারে উঠেছিল তিন টাকা আট আনা । গুণধর অবিশ্রি বুক-পকেটের নোটটি ভাঙ্গিয়ে অনেক কষ্টে ট্যাক্সী-ড্রাইভারের ঋণ শোধ করলে । কিন্তু লতিকা বলে উঠল, পালাবেন না যেন গুণধর বাবু ! আপনাকে চা খেয়ে যেতে হবে ।

গুণধর মনে মনে ভাবলে, তিন টাকা আট আনা পকেট থেকে :
খসল, চা-টা খেয়ে যতটা উশুল করা যায় ! তাই আর সে বিশেষ
আপত্তি জানালো না। উপরন্তু গড়ের মাঠের ‘ধকলে’ ফ্রিডেটাও
জমে উঠেছিল ভালো ভাবে।

সে শাস্ত সুবোধ ছেলেটির মতো লতিকার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে
উঠে গেল। সেখানে লতিকার বাবার কাছ থেকে পেল প্রচুর
অভ্যর্থনা, লতিকার ভাই ঝন্টু এরোপ্লেন তৈরীর কল-কৌশল
ছ’মিনিটের মধ্যে ওকে বুঝিয়ে দিলে। লতিকার ছোট বোন গীতিকা
গান শুনিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালে এবং লতিকার মা নেপথ্য
থেকে লুচি, বেগুনভাজা আর আলুর দম পাঠিয়ে গুণধরের ক্ষুধিবৃত্তি
করলে। লতিকা নিজে এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে
সে দিব্যি নিজের বেশ পরিবর্তন করে নিয়েছে ! তার চেহারাটা দেখে
কে বলবে খানিকক্ষণ আগেই গড়ের মাঠের বিপুল জনতার মাঝখানে
সে সঙ্গীহীন ভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। লতিকার নিজের হাতের
তৈরী বলে কি-না বোঝা গেল না, তবে গুণধর চোখ বুজে বেশ
আমেজ করে চা-টা পান করলে।

তারপর হঠাৎ তাকিয়ে বললে, অনেকক্ষণ আপনাদের বিরক্ত
করলাম, আজ তা হলে আসি—

এইবার লতিকার প্রত্যুত্তরের পাল।। সে গুণধরের পকেটে
তিনটি টাকা আর একটি আধূলি ফেলে দিয়ে বললে, এইবার বাড়ী
গিয়ে বই খুলে বসুন, কিন্তু মাঝে মাঝে এদিকে পা বাড়াতে
ভুলবেন না যেন !

লতিকা যে এমন মোলায়েম ভাবে তাকে চাবুক মারবে একথা

আগে জানা থাকলে গুণধর নিশ্চয়ই ট্যাক্সীর ভেতর তার দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ পেত এবং অমন নিলজ্জের মতো ঘন ঘন মিটারের দিকেও তাকে তাকাতে হত না !

ল্যাজ-গুটোনো কুকুরের মতো এক পা ছুঁপা করে সে নিজের বাসার দিকে পা চালিয়ে দিলে, ভদ্রতাসম্মত ভাবে বিদায় গ্রহণ করা পর্যন্ত তার হল না ।

বাসায় ফিরে অপমানের প্রতিশোধ নিলে সে তার বালক ভৃত্যের ওপর । সে যে সারাটা দিন ফাঁকি দিয়েছে এই কথাটাই অনর্গল বাক্যশ্রোতে সে প্রমাণ করে দিলে এবং তারপর ঘোষণা করলে যে, রাভিরেঁ সে কিছুই খাবে না ।

যে লেখাটি অবলম্বন করে তার দশটি টাকা প্রাপ্তি ঘটেছিল তার ওপরও গুণধরের আক্রোশ বড়ো কম হয়নি । শ্রীমতী বসুন্ধরা মিত্রের নামে লেখাটি মুদ্রিত হয়েছে । কে জানে এই বসুন্ধরা কোন জগতের মানুষ ? তার অস্তিত্ব আছে কি না তাই বা কে বলতে পারে । লেখাটি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সে দোতলার জানালা গলিয়ে উড়িয়ে দিলে ।

তারই কয়েকটি ছেঁড়া কাগজ লতিকার পড়ার টেবিলে উড়ে গিয়ে হাজির হল ।

কিন্তু লতিকা সম্মার্জনীর আঘাতে আবার সেগুলিকে নীচে রাস্তায় ফেলে দিলে, মুহূর্তের তরে জানতেও পারল না যে, এগুলি তার নবপরিচিত গুণধরবাবুর কলমের ডগায় সৃষ্ট হয়েছে ! জানতে পারলে সেই ছিন্নপত্রগুলি শ্রীমতী অঞ্চলে বেঁধে রাখত কি না কে জানে !

এর পর ঘটনা একেবারে মন্থর হয়ে এসেছিল। কেন না, লতিকা কলেজে যায় নিজেদের বাড়ীর গাড়ীতে, আর গুণধর যায় ট্রামে। পরস্পর ইতিমধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

সেদিন হঠাৎ কি একটা বিরাট মিছিলের জন্তে সমস্ত ট্রাম বাস বন্ধ। অথচ একটা জরুরী ক্লাশ আছে সকালের দিকে। গুণধর হতাশ হয়ে একটি রিক্সার সঙ্গে দর-দস্তুর করছিল, এমন সময় পেছনে হর্ন শুনে সে থমকে দাঁড়ালো।

লতিকা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, আর দর করতে হবে না, আসুন, আমি আপনাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

গুণধর একবার ভাবলে, লতিকা যেভাবে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে তাকে অপমান করেছে তারপর সে ওর সঙ্গে আর কথাই বলবে না।

কিন্তু মুস্থিল বাঁধলো যে, একটি স্ত্রী মেয়ে গাড়ীর দরজা খুলে ডাকাডাকি করছে—এই দৃশ্য দেখেই রাস্তায় লোক জমতে শুরু হয়েছিল। এর পর সে যদি মান-অভিমানের পালা গেয়ে একটা দৃশ্যের অবতারণা করে তবে আর কেলেঙ্কারীর অবধি থাকবে না। তাই সে বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য না করে গাড়ীর ভেতর উঠে বসল।

লতিকা আড় চোখে তাকিয়ে বললে, আমাদের বাড়ী আর গেলেন না যে বড়ো? পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অসহযোগ শুরু করলেন নাকি?

গুণধর আমতা আমতা করে উত্তর দিলে, না—মানে সময় পাইনে কিনা! কয়েকটি লেখা নিয়েও ব্যস্ত ছিলাম—

লতিকা যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল। বললে, ভালো কথা,

আপনি ত একজন উদীয়মান লেখক, আর আমি বাঙ্গলায় পাশ নম্বর একবারও রাখতে পারি নে। আপনি আমায় বাঙ্গলাটা ভালো করে শিখিয়ে দিন। সময় নেই বলে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না কিন্তু।

কথায় বলে, পাগ্লা খাবি? না ঝাঁচাবো কোথায়?

গুণধর যেন এই রকম একটি অনুরোধের আশাই করছিল; কাজেই তার দিক থেকে রাজি হতে আর বেশী বিলম্ব হ'ল না।

এর পর থেকে গল্পের গতি যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলো তাকে একমাত্র হিন্দি সিনেমার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

নায়ক আর নায়িকার যদি পরিচয় ঘটে গেল তবে গল্প বুন্দো মোষের মতো সামনে এগিয়ে যাবে না কেন? আশে-পাশের কারো দিকে তাকাবার অবকাশ তখন আর থাকে না! চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে থাকলে টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসা ফিঙে পাখিটি যেমন প্রবল বেগে কাছে এসে অধিকতর দ্রুত বেগে বহু দূর চলে যায়, তেমনি নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে গল্প যেন গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের ওপর দিয়ে আশী মাইল বেগে উড়ে চলো।

নায়ক গরীব হতে পারে, কিন্তু নায়িকার আছে নিজস্ব গাড়ী। সে ক্ষেত্রেও যদি গল্প না এগোয়, তবে গল্প লেখকের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

লতিকার নব-নব পরিকল্পনায় ওরা দু'জনে আজ বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে, কাল বেলুড়ে, পরশুদিন মেট্রোতে ঘূর্ণির বেগে ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর কলেজ, পড়া, রুটিন, এগজামিন প্রভৃতি তাদের সঙ্গে সমানে তাল রাখতে না পেরে হাঁপিয়ে ক্রমশ তাদের দু'জনার দৃষ্টি থেকে পেছিয়ে পড়তে লাগলো।

ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালের পাশে সেদিন অটেল চাঁদের আলো ।

গুণধর বলে, লতু, তোমার বোনের মুখে শুন্তে পাই তোমার কাছেই সে সব গান শিখেছে । কিন্তু তুমি আমায় গান শোনাতে চাও না কেন শুনি ?

লতিকা মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলে, আগে খুব গাইতাম, কিন্তু দু' বছর হয় একেবারে ছেড়ে দিয়েছি । সত্যি বলছি, গলা ছেড়ে গাইতে আর পারি নে ।

গুণধর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, অসুবিধাটা কি ? টনসিল ? চলো, কালই তোমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই । যে রোগটি তোমার মধু-কণ্ঠের পথ আগলে রেখেছে তাকে আমার সতীন বলে সন্দেহ হচ্ছে । ওকে তুমি পুষে রাখতে পারো, কিন্তু আমি তাকে গলা টিপে মেবে ফেলতে চাই ।

লতিকা কোনো জবাব দিল না, শুধু স্নান হাসি হাসলে ।

আর একদিন বালি ব্রিজের ওপর । গুণধর মিনতি করে লতিকার দুটি হাত ধরে বলে, লক্ষ্মীটি ! এখানে কেউ কোথায়ও নেই । আচ্ছা, গলা ছেড়ে না গাইতে চাও গুণ্ গুণ্ করে গাইতে তোমার আপত্তি কি থাকতে পারে ?

লতিকা শুধু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, সত্যি, অমুরোধ কোরো না ! আমি বড্ড লজ্জা পাই । আমার উপায় নেই—তাই গাইতে পারিনে ! নইলে আমার সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে থাকে তোমায় গান শোনাবো বলে ! কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, গাইতে তুমি আমায় বোলো না !

এর পর আর কোনো কথা চলে না, তাই গুণধর অতৃপ্ত আকাজক্ষা নিয়ে চুপ করে যায় !

একদিন গুণধর বলে, তোমার বাড়ীতে গেলেই রাশি রাশি খাবার এনে আমায় খেতে দাও। কিন্তু একদিনও আমি তোমায় কিছু খাওয়াতে পারলাম না। আমার বুঝি ইচ্ছে করে না ? আজ তোমার কোনো ওজর-আপত্তি শুনবো না। ফিরপোতে আমি অর্ডার দিয়েই রেখেছি। পোলাও, মাংস আর পুডিং...। তোমার ড্রাইভারকে সেইখানে গাড়ী নিয়ে যেতে বলে।

লতিকা শুধু ওর হাতটায় চাপ দিয়ে বলে, শোনো গুণ, এত ব্যস্ত হতে নেই, আমি কোথায়ও খাইনে। তুমি আমায় ক্ষমা করো—

গুণধর বিরক্ত হয়ে শুধায়, এ যুগের মেয়ে তুমি, তোমার হোটেলে যেতে এত আপত্তি কেন ?

লতিকা বলে, প্রশ্ন কোরো না, আমি তার জবাব দিতে পারবো না। যাবার হ'লে আমি তোমার সঙ্গেই যেতাম—আর কারো সঙ্গে নয়, একথা তুমি সহজভাবেই বিশ্বাস করো গুণ !

গুণধর মনে মনে চটে ! হিসেব করে দেখে, ফিরপোর বিল ব্যবদ বেশ কিছু টাকা মেটাতে হবে, কিন্তু লতিকার একশ'য়েমীতে কিছুই আদান করা গেল না !

সেদিন সন্ধ্যাবেলা লতিকার বাবার নিজস্ব বসবার ঘরে একান্তভাবে গুণধরের ডাক পড়ল।

গুণধর ভাবলে, ব্যাপারটা কি ? বুড়ো তার মেয়ের সঙ্গে এত বেশী মেলামেশা পছন্দ করছে না বোধ হয় !

যদি শক্ত কথা কিছু বুড়ো বলে, কিম্বা তেমন কিছু মেজাজ দেখায় তবে সোজাসুজি নমস্কার জানিয়ে একেবারে অ্যাবাউট টার্ন করবে, আর এ বাড়ীমুখো হবে না।

কিন্তু এখানেও গুণধরের জন্তে অনেক বিস্ময় জমা হয়ে ছিল। লতিকার বাবা বলেন, দেখ বাবা, লতুর মা বলছিলেন, তোমায় নাকি তিনি জামাই করতে চান, লতুরও নাকি এ ব্যাপারে মত আছে। বুঝতেই পারছ বাবাজি, আমি আবার তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি নে। লতুর মা আর লতুকে তাই আগেই সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ইয়ংমান, তোমার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘরোয়া কথা আছে।

এতখানি সৌভাগ্যের জন্য গুণধর সত্যি প্রস্তুত ছিল না। নিভৃত রাত্রের স্বপ্নে যাকে কামনা করা যায় সে যদি বাস্তবের মাঝে এসে ধরা দেয়, তবে আনন্দ রাখবার আর ঠাই থাকে না!

প্রথমটা তার মুখ দিয়ে এ সম্পর্কে কোন কথাই বের হ'ল না!

কিন্তু লতিকার বাবা কারো কথার জন্তে অপেক্ষা করবার লোক নন। তাঁর বক্তব্য তিনি বলেই চলেছেন: দেখ বাবাজি, আমার মেয়েকে যদি তুমি বিয়ে করো, তবে আমি তোমায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবো, সে সম্পর্কে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। সারা জীবনে কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো জমিয়েছি। ছেলেদের জন্তে বেশ কিছু রেখে যেতে পারবো বলেই আশা করি। আমার লতুর বরকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবো—এই আমার বহু দিনের সঙ্কল্প। তুমি লগুনে ব্যারিষ্টারী পড়তে যেতে রাজি আছ ত? অবশি আমি মেয়ের কাছে শুনেছি যে, তুমি সাহিত্য-চর্চা করো।

তা ব্যারিষ্টার হলেও সাহিত্যচর্চায় কোনো বিশ্ব হবে না। তোমাদের প্রভাত মুখুজ্জেও ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি আবার নামকরা গল্প-লিখিয়েও ছিলেন।

যে লোকটি আদপেই খেতে পায় না—তার সাম্নে রাজভোগ সাজিয়ে দিয়ে যদি বলা যায় যে, কিছুই আয়োজন করা সম্ভব হয় নি—সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মনেব অবস্থা সে সময় যেমন হয়—আমাদের গুণধরের অবস্থাও তদ্রূপ হয়ে উঠল!

যাকে বলে একসঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে! গুণধর কী বা বলবে, আর কেমন করেই বা ধন্যবাদ প্রদান করবে ভাবী প্রেয়সীর পিতৃদেবকে।

কাজেই কোনো কিছুই করা সম্ভবপর হল না তার দ্বারা! সে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় বারান্দায় জুতোর শব্দ শোনা গেল। লতিকার বাবা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, ওই বুঝি লতুর মা ফিরে এলেন। তা বাবা, আমার প্রস্তাবে তোমার কোনো আপত্তি নেই ত?’

এইবার গুণধর নিজেকে কোনো রকমে আত্মস্থ করে লতিকার বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে জবাব দিলে, এ ত আমার সৌভাগ্য।

সেদিন বাসায় ফিরে আসবার মুখে গুণধর লতিকার কানে কানে বলে এলো, কাল সন্ধ্যাবেলা বাসায় থেকো, ছ’জনে একলাটি বেড়াতে বেরুবো। অনেক দূর যাবো—অনেক কথা বলব। আর গান শুনবো তোমার।

লতিকা একটি আনন্দোজ্জ্বল বিলোল কটাক্ষে সম্মতিজ্ঞাপন করলে।

পরদিন বিকেলের একটু পরেই ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে

একটি গাড়ী দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। আজ লতিকা নিজের হাতে গাড়ী ড্রাইভ করছে, ড্রাইভারকে সঙ্গে আনে নি; কি জানি গুণধর আনন্দের আতিশয্যে কখন কি করে বসে। অথবা লতিকার মনেই কোনো গোপন কামনা আছে কি না কে জানে!

নারীর মনের হৃদিশ দেবতারা অবধি জানেন না, গুণধর ত কোন্‌ ছার!

গাড়ী যখন এক নির্জন মাঠের ধারে পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে!

গুণধর বলে, লতু, চলো আজ আমরা ছুটিতে এই নির্জন মাঠের অন্ধকারে আত্মগোপন করে মনের কথার হরির-লুট ছড়াই...

লতু রসিকতা করে জবাব দিলে, মাঠে গিয়ে বসতে চাইছ চলো, কিন্তু অন্ধকারে আত্মগোপন করা মোটেই চলবে না। বাঁশ গাছের পাশ দিয়ে দেখছ ত' চাঁদ উকি দিচ্ছে। আজ পূর্ণিমা।

গুণধরের মনেও যেন হঠাৎ জোয়ার ডেকে উঠল। বলে, বেশ ত', পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবনে আমরা পুরোপুরি মন দেয়া-নেয়া করি। কারো মনে কোনো কথা আমরা কেউ লুকিয়ে রাখবো না। তোমার কথা আমি জানবো, আমার কথা শুনবে তুমি।

লতিকা মাথা ছুলিয়ে বলে, বেশ, তাই হবে।

গুণধর আজ মুখর হয়ে উঠেছে। বলে, আজ কিন্তু তোমায় গান শোনাতে হবে। কোনো আপত্তি আর শুনছিনে আমি।

লতিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘাসের গালিচার ওপর আরাম করে বসল গুণধর। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল একটি তাকিয়া পেলে এই জ্যোৎস্না-খোত সন্ধ্যায় তার আবেশটি জমত ভালো।

—একটি আধুনিক প্রেমের গান ধরো—মানে সিনেমার গান ।
ফরমাস দিলে গুণধর ।

লতিকা বলে, গান ত' আমি গাইতে পারি নে !

—আচ্ছা লতু, সবতাতেই তোমার আপত্তি কেন বল ত ?
আমি গান গাইতে বলে তুমি গাইবে না, খেতে বলে খাবে না !
আমার মনে কি কোনো সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই ? গুণধর
অভিযোগ তোলে ।

মধুর কণ্ঠে লতিকা জবাব দিলে, আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি
কিছু খেতে চাইলে কিম্বা আমায় খেতে দিলে আমি না করবো না ।

লতিকার মনে অনেক আশা । সে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ।

কিন্তু কথা-শিল্পী গুণধর তার ধাবে-কাছেও গেল না ।
উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, 'নভেল আইডিয়া' আমার মাথায় এসেছে ।
এই চীনে-বাদামওলা, শীগ্‌গীর এই দিকে আয় । এসো লতু, আজ
আমরা নির্জনে বসে চীনে-বাদাম খাই—

রাসীকৃত চীনাবাদাম কোঁচায় জড় করে হাসিমুখে সে লতিকার
দিকে তাকালো ।

লতিকার মুখের প্রদীপ নিভে গিয়ে যে স্নান হয়ে এসেছে
সেদিকে গুণধরের দৃষ্টি নেই । বলে, নাও ধরো, 'দশন-মুকুতাপাতি'
না হয় আমায় দেখালেই—

সত্যি লতিকার মুক্তোর মতো দাঁত গুণধরের এক পরম
বিস্ময় । চাঁদের আলোতে দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে ।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি চীনাবাদাম তুলে নিয়ে লতিকা
প্রবল কামড় দেয় ।

কিন্তু পর মুহূর্তেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। লতিকার মুখ থেকে ছিটকে খুলে বেরিয়ে এলো দু'পাটি বাঁধানো দাঁত



ঠিক গুণধরের সামনে-
কার ঘাসের আস্ত-
রণের ওপরে! তাঁদের
আলোয় দাঁতগুলি
বীভৎসভাবে চিক্‌চিক্‌
করে উঠল। লজ্জায়
বিশীর্ণ হয়ে লতিকা
আন্তর্নাদ করে উঠল।
আঁৎকে উঠে গুণধর
পেছু হটে গেল!

তার পর থেকে
আর কোনো কথা-

শিল্পী বা জীবন-শিল্পী এ কাহিনীর স্ফুট পরিসমাপ্তি করতে এগিয়ে
আসেন নি!



পূর্ব বঙ্গের নদীবহুল অঞ্চল দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় একটি পীমার যাত্রী-ভর্তি হয়ে চলছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই পীমারটিতে একটি ঘরোয়া বৈঠক বসে। বৈঠকের সভাবৃন্দ হিন্দু আর মুসলমান দুইই আছেন। এই জাতীয় ছোট পীমারে সারেঙই সর্বেসর্বা।

শাহানশা বাদশার মতো তাকে মাণ্ডি-গণ্ডি করে চলে তার
অমুগত জন। কেননা সারেঙের কথার ওপর আর কোন আপিল
নেই এ কথা ষ্টীমারের কর্মচারীগণ সবাই জানে।

বস্তুতঃ কোম্পানীর কাছ থেকে ইজারা নিয়ে সারেঙই সারা
বছর কাজ চালায়...সেই জন্ত ষ্টীমারের কাজে 'বহাল' আর 'বরখাস্ত'
সব সারেঙের মন-মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

অমুগত এক খালাসী সারেঙের হাতে ফর্সা ছাঁকো তুলে দিলে।
সারেঙ মুদ্রিত নয়নে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টেনে ধোঁয়া
ছাড়তে লাগলো।

ষ্টীমারের ভেঁতরকার চা-খাবারের দোকানের ইজারদার গোবিন্দ
মোদক জিব আর তালুতে একটা বিক্ষোভের ধ্বনি তুলে বলল, যা
দিন কাল পড়েছে সারেঙ সাহেব, তাতে উপরি-পাওনা আমাদের
একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। যা হোক একটা বুদ্ধি বাৎলাও
মিঞা সাব!

চোখ না খুলে একটা গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে সারেঙ বলল, জলের
ওপর আর উপরি পাওনা কি হবে? আগে বড় বড় লোকেরা
এই লাইনে যাতায়াত করত'...সারা বছরে সকলেরই বক্শীস্টা
ভালই পাওনা ছিল। এখন এই মগের মুল্লকে কে আসবে শুনি?

গোবিন্দ মোদক জবাব দিলে, ওদিকে কলকাতায় কথায় কথায়
কালো-টাকার থলি খুলে দিচ্ছে লোক। আমরা কি পেট শুকিয়ে
থাকবো সারেঙ্ ভাই?

বাটলার গণি মিঞা এতক্ষণ চুপচাপ বসে কথা শুনছিলো।
ফৌস করে উঠে ফৌড়ন দিলে, মুগী রেঁধে আর মনে সুখ পাই না,

হিন্দুরা সব চলে গেল বিদেশে। দেশে যাতায়াতের পথে ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা কি তারিফই না করত আমার রসুইয়ের। বেগুনে আর সে বাসনা নাই। বকশীস ত' উঠেই গেছে কর্তা।

টিকিট ক্লার্ক নটবর ভাণ্ডারী রাগের মাথায় খানিকটা সিক্‌নি ফেলে দিয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে, ঠিক কথা বলেছ গণি মিঞা। থার্ড ক্লাসের টিকিট করে উঠে ভাঁড়ের চাপে বাবুরা ফাষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে যাবে, তবে না আমার উপরি পাওনার রাস্তা খুলে যায়। থার্ড ক্লাসের টিকিট 'পাঞ্চ' করে-করে হাতে ব্যথা ধরে গেল! সত্যি* মিঞা ভাই, মনে আর সুখ নেই। সামনে জামাই ষষ্ঠী; উপরি পাওনা না হলে জামাই বাড়ী দেবো-থোবো কি?

সারেঙ্ মহাহাশ্বে জবাব দিলে, হুঁ! বুঝলাম ত' সবাই। কিন্তু আমি কি করবো কও—?

আল্লাবক্স জমাদার অতি বিনয়ে ঘাড় কাৎ করে বললে, এই পাণির মধ্যেও একটা পথ খোলা আছে হুজুর—

খাবারের দোকানের গোবিন্দ মোদক বিশেষ উৎসাহিত হয়ে বললে, কি পথ বলত' জমাদার—না হয় আমরা সবাই মিলে—

জমাদার আবার হাত দুটো কচলে বললে, হুজুর হুকুম করলে— বলতে সাহস পাই—

নির্লিপ্ত গান্ধীর্থে সারেঙ্ বললে, কও শুনি—

জমাদার চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে কহিলে অনেক আমের বুড়ি চালান যাচ্ছে হুজুর—

মাথা নেড়ে সারেঙ্ বল্লে, ওতে সুবিধে হবে না—অন্য পথ
বাংলাও—

গোবিন্দ মোদক এইবার যেন অন্ধকার পথে চেরাগ খুঁজে
পেলো। বল্লে, সারেঙ্ সাহেব, হৃদিশ মিলে গেছে—এখন সব তোমার
ওপর ভরসা—

গণি মিঞা অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিলে, আরে কওনা বাবু,
আমার আবার মুরগী ছাড়াতে হবে। ডাঁটা আর কাঁঠাল বিচি খেয়ে
মুখ পচে গেছে।

গোবিন্দ মোদকের মুখে-চোখে একটা আবিষ্কারের উল্লাস।
সাবেঙের কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে, ষ্টিমারটা আজ রাত্রে নদীর
চরে আটকে দাও না—সারেঙ্ সাহেব—

সারেঙ্ এইবার চোখ খুল্লে। শুধোলে, তা হলে কি সুবিধেতে
হবে শুনি ?

গোবিন্দ মোদক বল্লে, আলবৎ সুবিধে হবে সারেঙ্ ভাই।
চিড়ে আর মুড়ির দাম—চড়্ চড়্ করে চার টাকায় উঠে যাবে।
খাবার গুলো ছনো দামে বিক্রী করতে পারবো—

বাটলার গণি মিঞার চোখ ছুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লে। বল্লে হাঁ,
কর্তা। তা হলে আমি গোটা কয়েক মুর্গী জবেহ করতে পারি।
পেটের ক্ষিদেয় প্যাসেঞ্জাররা সোনা মুখ করে চার গুণ দাম দিয়ে
কিন্বে।

জমাদার বল্লে, সামনের ইষ্টিয়ণের চর থেকে আমি তা হলে কিছু
দুধ কিনে ফেলি। চড়া দরে চালিয়ে দেবো।

টিকিট ক্লার্ক একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, রাত্রে ঘুমোবার

জন্মে তাহলে বাবুদের ফাষ্টি-সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে উকি-ঝুঁকি মারতেই হবে। বেশ কিছু কাঁচা পয়সা হাতিয়ে নিতে পারি।

সারেঙ বাবাজী এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলি গিল্ছিল আর গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল, ভুরুটা কুঁচকে বসে, সবই ত বোঝলাম। কিন্তু আমার তাতে লাভ ?

গোবিন্দ মোদক উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে বসে, লাভ ? তোমার বখরা থাকবে সারেঙ সাহেব। শুভ কাজে আর আপত্তি কোরো না। এই মা গঙ্গার ওপর দাঁড়িয়ে বলছি, মোটা বখরা দেবো তোমায়।

সারেঙ তবু চোখ খোলে না।

গণি মিঞা, গোবিন্দ মোদক, নটবর ভাগারী, জমাদার আল্লাবক্স সবাই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

আরো খানিকটা ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে দিয়ে সারেঙ কথা কইলে। বসে, আধাআধি বখরা আমার। রাজী থাকো ত' কথা কও গোবিন্দ বাবু—। এক টু

আঁধার না হলে চরে ইষ্টিমার আটকানো যাবে না।



গণি মিঞা, নটবর, আল্লাবক্স সবাই গোবিন্দ মোদককে শ্রী
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

অর্থাৎ রাজী হয়ে যাও দাদা,—আমরা ত’ সব দিক দিয়ে
পুষিয়েই দেবো—

খালাসীরাও ইতিমধ্যে কেউ কেউ ছু একবার উঁকি মেরে গেছে।
ঘটনাটা কদরু এগুলো তারাও জানতে চায়—

সারেঙ তাদের একজনকে ধমক দিয়ে বলে, এই, তুই
এখানে কি শুনছিস? যা—ইষ্টিমারে চেরাগ জ্বালিয়ে দি গে
যা—

খালাসীরাও খতমত খেয়ে চলে গেল।

গোবিন্দ মোদক তখনো ইতস্তত করছিল। অনেকগুলি চিড়ে
আর গুড় কেনা আছে। মনে মনে হিসেব করে দেখল, ষ্টিমার
আটকালে প্যাসেঞ্জাররা সঙ্গে সঙ্গে ছুনো কিস্বা চারগুণ দরে মাল
কিনে নেবে। পেটের খিদে বড় সোজা কথা নয়। সঙ্গে কাচ্চা
বাচ্চাও ত আছে।

হঠাৎ সে বলে বসল, রাজী—

বৈঠকের লোকেরা সবাই এক সঙ্গে হল্লা করে উঠল।

সারেঙ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জলের ওপর কাজ করে করে তার
চুল আর দাড়ি দুইই পেকে গেছে। নিজের মনের আনন্দ গোপন
করে সবাইকে ধমক দিয়ে বলে, না—না এখানে আর হল্লা নয়—
যে যার ডিউটিতে যাও। সামনে চরের ইষ্টিশান যার যা কেনা কাটা
চট্ট পট্ট সেরে নাও।

হাসি মুখে সবাই উছোঁগ পর্বের জন্তু চলে গেল। ইষ্টিমারের

‘চেরাগকে’ সাক্ষী রেখে হিন্দু-মুসলমানের অলিখিত প্যাক্ট বিনা রক্তপাতে সমাধা হয়ে গেল।

এইবার যাত্রী দলে ফিরে আসা যাক।

চরের স্টেশন ছেড়ে গেছে।

সন্ধ্যা আরো খানিকটা ঘনিয়ে এসেছে।

হিন্দু যাত্রীদের মধ্যে যারা তীর্থ-যাত্রী তারা এক যায়গায় জটলা করে এক বুড়ো বায়ুনের কাছে রামায়ণ শুনছে।

মুসলমান যাত্রীদের মধ্যে বয়স্ক কেউ কেউ সামনে ডেকের ওপর গিয়ে চাদর বিছিয়ে নামাজ পড়ছে। শিক্ষিত একজন মুসলমান কোরাণ পাঠ করছে আর একদল লোক তাই শুনছে। স্কুল-কলেজের ছেলেরা স্থানে স্থানে পৃথক আসর খুলে তাস খেলা শুরু করে দিয়েছে !

মেয়ে মহলে কোলের ছেলে মেয়েরা কানাকাটিতে কেবিনগুলি সরগরম করে তুলেছে।

মেয়েরা তাদের বোঝাচ্ছে যে, সামনে ইষ্টিশানে ভালো ছুধ, মিষ্টি ফল পাওয়া যাবে—তাই কিনে রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। চায়ের দোকানে ভীড় লেগেই আছে।

যুবক সম্প্রদায় সেখানে চায়ের পেয়ালায় রাজনৈতিক তুফান তুলছে আর সিগারেট ফুঁকছে।

স্ট্রিমারে তিল ধারণের ঠাই নেই।

যাত্রীদল, ইস্কুল কলেজের ছাত্ররা, বাস্তুত্যাগীরা, ব্যবসায়ী মহল আর কৃষক সম্প্রদায় সকলকে নিয়ে একটি সন্ধ্যায় এক বৃহৎ পরিবার গড়ে উঠেছে।

পাটের আবাদ, ধানের মলন, ছেলের বিয়ে, মেয়ের নিকে,
ফুটবল খেলা, গুড়ের মণ, মাছের অভাব, অকারণ কোন্দল,
মর্ত্ত্ব এবং সর্বোপরি সন্তা রাজনীতি জায়গাটাকে শব্দ-ব্রহ্মের
গীর্ঘস্থানে রূপান্তরিত করেছে। সেই সঙ্গে হুঁকো আর সিগারেট
লাকের মুখে মুখে ফিরছে।

খালাসীদের মুখে নীচ থেকে শব্দ ভেসে আসছে—

“এখানে তাল মে—লে—না !”

হঠাৎ খচাৎ করে সমস্ত ষ্টিমারটা ভূমিকম্প হওয়ার মতো
যাত্রীদের কাঁপিয়ে তুলে উঠল। যারা দাঁড়িয়েছিল—তাল সামলাতে
না পেরে এ-ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে গেল।

তারপর চারিদিকে একটা জল আলোড়নের শব্দ, তারপরই স্থির !

বিভ্রাৎ প্রবাহের মতো ষ্টিমারের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি
গভী রটে গেল যে—জাহাজ চরে আটকেছে !

তারপর ইঞ্জিনের ফৌসফোসানি—

বাঁশীর ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস—

খালাসীদের চ্যাচামেচি—

কয়লার ক্রমাগত আত্মহুতি—

কিছুতেই কিছু নয়— !

ওদিকে যাত্রীদের মধ্যে—

সমবেত—খেদ—হায় আল্লা— !

তীর্থ-যাত্রীদের করুণ কাকুতি—

একি করলে জগন্নাথ— !

মেয়েদের মর্মস্তুদ আর্তনাদ—

গুপ্তির মুখে কি এখন ছাই দেবো— ?

তখনি মিন্সেকে বল্লাম কিছু চিড়ে গুড় বেঁধে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে মিন্সেদের দ্রুত পদ-ক্ষেপের শব্দ শোনা গেল—

খাবার ও চায়ের দোকানে সব ভেঙ্গে পড়ল—

খালাসীরা চীংকার করে উঠল—

সব একদিকে জমায়েৎ হলে জাহাজ উণ্টে যাবে ।

কিছুক্ষণ বাদেই ভগ্নদূতের দল জানিয়ে দিল যে,—চিড়ের দাম সাড়ে তিন টাকায় উঠেছে । গুড় যা ছিল খরচ হয়ে গেছে । আর মিষ্টি-খাবার সব ইস্কুলের ছেলেরা কিনে উদরের অগ্নিদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করেছে ।

তখন বয়স্ক কয়েকজন ব্যক্তিকে পৈতে লুকিয়ে আর টিকি আড়াল দিয়ে বাটলারের আশে পাশে উকি-ঝুঁকি মারতে দেখা গেল ।

বাটলারের মুখে আর হাসি ধরে না ।

সে ঘন ঘন মাথা নাড়ে আর নীচে গিয়ে মূর্গি জবাই করে ।

সন্তানবতী মেয়েদের কল্যাণকামী রূপে জমাদার আল্লাবক্সের শুভ আবির্ভাব হয় ।

হাতে তার দু' বালতি দুধ ।

তা' দাম একটু বেশী হোক ।

বাচ্চাদের ত' গলা ভিজবে ।

দু' বালতি দুধের এক ফোঁটাও পড়ে রইল না । দাম যা উঠল সেটা হিসেব করতে জমাদার একেবারে হিম-সিম !

টিকিট ক্লার্কের কাছেও আবেদন-নিবেদনের বিরাম নেই ।

যাঁদের ট্যাঁকে কিছু আছে তারা গোপনে ভালো রকম দক্ষিণা দিয়ে কেবিনগুলি দখল করে ফেল্ল।

বাদ বাকি যাত্রী একেবারে মাছ-পাতুরী !

অধিকাংশ যাত্রীরই নিশিপালন করতে হল। কচি ছেলের কান্না, মহিলাদের পূজো মানসিক, বুড়োদের বিনিদ্র রজনী যাপন, ছাত্রদের আন্দোলন, কিছুই—হিন্দু-মুসলীম প্যাঙ্ককে এতটুকু শিথিল করতে পারল না।

হায় মহাত্মা গান্ধী !

এই অভিনব প্যাঙ্কের অন্ধি-সন্ধি তিনি আজীবন তপস্রায় আয়ত্তে আনতে পারেন নি !



তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে, আলবোলা টান্তে টান্তে, নেত্রদয় অর্ধ-মুদ্রিত করে, নিশ্চিন্ত আরামে আমেজ করা চলে, বাঙলা দেশের সেই সময়কার এক গণ্ড গ্রামের কাহিনী ।

তখন রেশনের প্রবর্তন ও বসনের অভাব ছিলনা বলে মানুষ আজকের দিনের মতো তড়িৎ-গতি হয়ে ওঠেনি ; ফলে ফরাসের ওপর মজলিসী গল্প জমতো ভালো ।

জনার্দন ভট্টাচার্য ভাদ্রের শেষাংশে এক সন্ধ্যায় অহিফেনে মজলিসী মনকে মাধুর্য্যময় করে দীপালোকে সত্ত্ব আগত ‘সঞ্জীবনী’ পাঠ করছিলেন—এমন সময় হস্ত-দন্ত হয়ে গজানন গলুই একটা ভাঙা ছাতা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই ডান হাতে ভট্টাচার্যের পদ স্পর্শ করে জিবে ঠেকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে, কর্তা শুনেছেন ?

‘সঞ্জীবনী’ থেকে মুখ না তুলেই জমিদার জনার্দন বলেন, হ্যাঁ, কল্‌কাতায় কথা-কওয়া ছবি এসেছে—এই ত’ ছাপার হরফে বড় বড় করে লিখে—

যথাসম্ভব চোখ ছুটিকে বড় করে গজানন গলুই জবাব দিলে, আজ্ঞে, ছবির কথাই নয়—। চক্রবর্তীরা এবার প্রতিমা হুজুরের চাইতে আধ-হাত উঁচু করেছে ।

এইবার ভট্টাচার্য চোখের চশমাটি খুলে রাখলেন, তারপর খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলেন, ঝ্যাঁ ! তুমি বলছ কি গজানন ? আমার প্রতিমা থেকে চক্ৰোত্তির প্রতিমা আধ-হাত উঁচু ? উহু ! কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ।

এই ব্যাপারে তারও যে বিশ্বাসের পরিসীমা নেই এই রকম একটা মুখের ভাব করবার চেষ্টা করে গজানন গলুই বলে, আজ্ঞে, আমি নিজ কানে শুনে এলাম যে ! সবাই বলাবলি করছিল যে, এবার দুর্গো পূজায় চক্ৰোত্তিরা হুজুরকে হারিয়ে দিয়েছে !

—হু ! হারিয়ে দিয়েছে ! ভট্টাচার্য গর্জে উঠলেন । বাইরে কুমোর প্রতিমায় রঙ লাগাচ্ছিল । পূজার আর বিলম্ব নেই ।

আশ্বিনের প্রথমেই দশভূজার শুভাগমন। কিন্তু জনার্দন ভট্টাচার্যের মনে হল—দশভূজা যেন তাঁর দশ হাতের দশটি চড় তার দুইগালে কসিয়ে দিলেন !

এ পরাজয় মেনে নেয়া ত' মৃত্যুর সামিল। ভট্টাচার্যদের প্রতিমা গাঁয়ের সকল মূর্তির ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এই ত' চিরকাল সবাই জেনে আসছে। ভাসানের মিছিলে ওঁদের মূর্তি সকলের শিরোভাগে।

তিনি বেঁচে থাকতেই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে? জনার্দন ভট্টাচার্যের অহিফেনের নেশা ছুটে গেল। তিনি কর্মনিরত কুমোরকে আহ্বান করলেন।

কিন্তু এখন আর প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধি অসম্ভব। তা' ছাড়া তৈরী প্রতিমা ভাঙা চলে না, তাতে পরিবারের অকল্যাণ হতে পারে।

নিখিল আক্রোশে ভট্টাচার্য গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে লাগলেন।

গজানন গলুই মাথা চুল্কে বল্লে, আজ্ঞে, এক কাজ করলে হয় না? মিছিল বের করবার সময় একটা উঁচু মাচা তৈরী করে দিলেই হবে।

জনার্দন এইবার মুখ খুল্লেন। বল্লেন, মাচা বেঁধে আমি টেকা মারবো ভেবেছ? মোটেই নয়। তুমি কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ো গজানন, একদল ভালো যাত্রা বায়না করে আসবে। চক্কোত্তিরা হারাবে ভট্টাচার্যদের? যা কোনো কালে হয়নি—সে ব্যাপার আমিও ঘটতে দেবো না।

এই জাতীয় উত্তেজনামূলক এবং মুখরোচক কাজ পেলে গজানন গলুই আর কিছুই চায় না। যাত্রা বায়না করবার অজুহাতে ছু'পক্ষ থেকেই যে বেশ উপরি লাভ হবে সেই কথা অনুধাবন করে গজানন বিশেষ পুলকিত হয়ে উঠল।

গজাননের এক ভাগনে চকোভিদের ওখানে চাকরী করে। রাত্তিরে তার বাড়ী গিয়ে উস্কে দিলে, যদি সে-ও জনার্দনের এই যাত্রা-পর্বের উল্লেখ করে অপর একটি যাত্রার দল বায়না করবার সুযোগ পায়।

মামা-ভাগ্নেতে বহুক্ষণ কি সলাপরামর্শ হল সে কথা তারাই ভালো বলতে পারে। তবে আশু-প্রাপ্তি যোগের সম্ভাবনায় উভয়েই পুলকিত হয়ে উঠল।

জনার্দনের মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। স্বয়ং জনার্দন বারান্দায় একটি জলচৌকির ওপর বসে লোক জনের কাজকর্ম দেখছেন আর গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন। যুদ্ধ-জয়ের একটা গরিমা তাঁর চোখে-মুখে ফুটে বেরাচ্ছে। এমন সময় ভগ্নদূতের মতো গজানন গলুই এসে উপস্থিত হল।

চোখ ছুটো একবার নাচিয়ে নিয়ে জনার্দন জিজ্ঞেস করলেন, কি হে গজানন, তোমার যাত্রার আসর কেমন হচ্ছে? অধিকারীর পছন্দ হবে ত' ? আর দেখ, ঐ দিকে চিকের ব্যবস্থা থাকবে। সারা গাঁয়ের মেয়েরা বসে যাত্রা শুনতে পারবে, সে আয়োজন আমি করে রাখবো। ওদিকে কাক-পক্ষীও উঁকি দিতে যাবে না। আমার নেমন্তন্ন হবে নারদের নেমন্তন্ন। জনার্দন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

গজানন গলুই এতক্ষণ ধরে হুজুরের কথাগুলি গিল্ছিল আর একটা সুযোগ খুঁজছিল কখন তার বক্তব্য সে শুরু করতে পারে।

হুজুরের হাসিব ফাঁকে সে শুধু জোড় হস্তে নিবেদন করল,—
আজ্ঞে সর্বনাশ !

জনার্দন আর একটি সুখটান দিয়ে বল্লেন, সর্বনাশ কি হে ? বরং বলো বাজীমাং। গজানন বল্লেন, আজ্ঞে না হুজুর ! চক্কোত্তিরা কল্‌কাতা থেকে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা এনেছে। এই মাত্রের গরুর গাড়ী থেকে সব নাবল কিনা। কি তাদের জাক-জমক, সাতটা কাঠের বাস্ত্র ভর্তি শুধু রঙ-বেরঙের পোষাক। লোকজন সব ধরাধরি করে নামাচ্ছে। অধিকারীর বিরাট চেহারা।

জনার্দনের মুখটি হঠাৎ আম্‌সির মতো শুকিয়ে গেল। কিছুক্ষণ তার মুখে যেন কে বোবা কাঠি ছুঁইয়ে দিলে।

অ্যা ! থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পাটি ! কলকাতা ! এই কথাটি অসংলগ্ন ভাবে তার মুখ থেকে খানিক বাদে বেরুল !

হুজুরকে এতখানি মুষড়ে পড়তে দেখে বোধ হয় গজানন গলুইয়েরও দয়া হল।

একটুখানি মাথা চুল্কে নিয়ে বল্লেন, আজ্ঞে, ওদের যাত্রা দলের ছোকরা অনেক বেশী হবে বটে...তবে আমাদের হবে রাম-রাবণের যুদ্ধ। আপনার ভিটে বাড়ীর যত প্রজা আছে সবাইকে ল্যাজ লাগিয়ে বানর সাজিয়ে দেবো...তারাই আসর মাং করে দিতে পারবে।

জনর্দন চোখ বন্ধ করে বল্লেন, যা হয় করো গজানন, আমি আর কিছু ভাবতে পাচ্ছি নে।

গলুই মশাই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না হুজুর, আসর মাং আমরা করবই !

সেদিন রাত্তিরে মামা-ভাগ্নের কথা হচ্ছিল।

ভাগনে বল্লেন, ভাগি়াস তুমি বুদ্ধি দিয়েছিলে মামা, তাইত' ছু'-ছুটো যাত্রার দল গাঁয়ে এলো। খুব মজা করে যাত্রা দেখে নেয়া যাবে।

মামা ফোঁড়ন দিয়ে জবাব দিলে, আরে রেখে দে তোর যাত্রা ! মিছি মিছি রাত জেগে শরীর নষ্ট করবার কোন মানে হয় ? ' ট্যাংক ভারী হ'ল কিনা সেই হিসেব আগে গিয়ে কর।

গাঁয়ের লোক কিন্তু থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টের চাইতে ভট্‌চাজ বাড়ীর রাম-রাবণের যুদ্ধই পছন্দ করল বেশী। একে মুখপোড়া হনুমানের লম্বা লাফ, তার ওপর গাঁয়ের যত চেনা লোক বানর সৈন্ত সেজে হুপ-হুপ শব্দে আসর গরম করে তুলেছিল ! তার কাছে চকোত্তি বাড়ীর “নহষ-উদ্ধার” পালা একেবারে যেন ঠাণ্ডা মিয়োনো মুড়ির মতো নেতিয়ে পড়ল !

যাত্রা আনার ব্যাপারে চকোত্তিদের খরচ হয়েছিল বেশী। কেননা খাস কল্‌কাতার দল—তাদের খাঁই বেশী। তাই জলের মতো টাকা খরচ করেও সুনাম হল না দেখে তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

গোপনে-গোপনে ঠিক করলেন—দরিজ-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করে ভট্‌চাজ বাড়ীর খ্যাতির ব্যারোমিটার কয়েক ডিগ্রী নামিয়ে

দেবেন। ‘ছোটলোক’দের চূড়ান্ত খাওয়া খাওয়াতে হবে। যাকে বলে একেবারে ফাঁসির খাওয়া। তাতে যদি গোটা কয়ের লোক মরে ত’ মরুক, কিন্তু চক্কোত্তি বাড়ীর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়বে।

কথাটা যথাসময়ে ভট্‌চাজ বাড়ী পৌঁছতেও বিলম্ব করল না। দুই পক্ষই গোপনে চিঁড়ে-দৈ থেকে শুরু করে সব রকম খাবারের আয়োজন করতে লাগল। ভট্‌চাজ বাড়ী যদি কাক-পক্ষীর মুখে শুনতে পেলেন, যে চক্কোত্তি বাড়ী বর্ধমানের সীতা ভোগ আনাচ্ছেন; অমনি জনার্দনের গোমস্তা ছুটল কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া সংগ্রহ করতে।

উদ্যোগ-পর্ব দেখে মনে হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষেণে কৌরব-পাণ্ডবও নিজেদের জয় সম্পর্কে এতখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

তারপর এলো সেই স্মরণীয় দিন। গ্রামবাসিগণ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো—

কাতারে কাতারে লোক! কেউ খেলো, কেউ ছাঁদা বাঁধল, আবার অনেককে চ্যাংদোলা করে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হল। এবার কিন্তু চক্কোত্তি বাড়ীর জয়-জয়কার পড়ে গেল। কারণ অনু-সন্ধান করতে গেলে কিন্তু হক্‌চকিয়ে যেতে হবে। গাঁয়ের লোক সমস্বরে বলে, ভট্‌চাজ বাড়ী আর এমন কি খাইয়েছিল? হ্যাঁ খাওয়ালে বটে চক্কোত্তিরা। সেই খাওয়া খেয়ে বাইশ জন লোক ওলা বিবির দয়ায় মারা গেল! আর ভট্‌চাজ বাড়ী পাত পেতে কারো পেটের ব্যথা পর্য্যন্ত হল না। ওটা আবার খাওয়া নাকি?

জনার্দন ভট্টাচার্য কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন।

গজানন গলুইকে ডেকে বল্লেন, এবার নতুন পাঁচ কসতে হবে। তুমি 'পাঁচশ' ঢাকী বায়না কর। প্রতিমা বিসর্জনের সময় এই 'পাঁচশ' ঢাক এক সঙ্গে বাজবে। গোটা গাঁয়ের লোকের কানে তালা লাগিয়ে দেয়া চাই। দেখি কেমন আমার জিত না হয়।

গজানন হাত জোড় করে বল্লেন, হুজুর, এইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। আপনি এমন খাওয়াটা খাওয়ালেন, আর গাঁয়ের লোকে বল্লেন কিনা, কেউ কলেরা হয়ে মারা যায়নি বলে আপনার দেয়া 'ফলার' ফলারই নয়। —মজাটা এবার টের পাবে সবাই।

ওদিকে গজাননের ভাগ্নের কাছ থেকে খবর পেয়ে চক্কোত্তি চুপ করে বসে রইলেন না।

দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনে জয়লাভ করে তাঁদের বৃকের ছাতি দশ হাত ফুলে উঠেছে। তলে তলে তাঁরাও হাজার ঢাকির বায়না করে বসে রইলেন।

প্রতিমা বিসর্জনের দিন সকাল থেকে গাঁয়ে কান পাতে কার সাধ্যি!

দেড় হাজার ঢাকি প্রাণপণে ঢাক পিটিছে। ফলে হাতের কাছের মানুষটিকে পর্যন্ত একটা কথা বলতে হলে বৃক্ষাটা চীৎকার করতে হচ্ছে!

এই বাজনা চল্ তিন রাত্রির তিন দিন।

নব বিবাহিত দম্পতিদের কান-কথা বন্ধ হয়ে গেল ! বাসর ঘরে কেউ আড়ি পাতে না—গোটা গাঁয়ের কাক-চিল পালিয়ে ভিন্ গাঁয়ে আশ্রয় নিলে । গরুর বাঁটে দুধ গেল শুকিয়ে—

চতুর্থ দিন সকাল
বেলা ভট্‌চাজদের
পাঁচশ ঢাকির ঢাক
গেল ফেসে—!

জনার্দন মা থা য়
হা ত দি য়ে ব সে
পড়লেন ।

সেই দিন সন্ধ্যা-
বেলা গাঁয়ের মাত-
বরেরা ভট্‌চাজ বাড়ী
সমবেত হয়ে মত
প্রকাশ ক র লে ন,

এইবার তোমারই জিত হয়েছে জনার্দন ভায়া । ঢাকের বাজি
থামলেই মিষ্টি !





অনেক অনুশীলনের অন্তে অসাধ্য-সাধন করা গেল। অসাধ্য সাধনের কথা শুনে পাঠক-পাঠিকারা হয়ত আন্দাজ করে নেবেন যে, আমি চন্দ্রগ্রহে যাবার একটি পাশপোর্ট সংগ্রহ করেছি। কিন্তু বিষয়টি মোটেই জগৎ-বহির্ভূত নয়, পুলি-মলিন এই মাটির পৃথিবীরই কথা।

ব্যাপারটা আরও ঘরোয়া করে বললে, এই দাঁড়ায় যে, বহু

হাঁটাহাঁটি করে, জুতোর শুকতলা খুইয়ে, বাড়ীওয়ালাকে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত করে, বহুবিধ সাধ্য-সাধনা অস্ত্রে একটি ফ্ল্যাট সংগ্রহ করেছি।

আপনারা একবারও মনে করবেন না যে, শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভিজ়েছে।

বেশ কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে এর পেছনে। আপনাদের কাছে গোপন করে লাভ নেই, পাকিস্তানে ঘর-বাড়ী বিক্রি করে যে হাজার টাকা ট্যাক্স নিয়ে কলকাতা সহরে এসেছিলাম তার প্রায় সবই বাড়ীওয়ালার গহ্বরে গেছে, সেনামী ও আগাম বাড়ী-ভাড়া বাবদ।

তা যাক্।

তবু এখন ফ্ল্যাটের বারান্দায় ছোট্ট একটি মাতুর বিছিয়ে ভাবতে পারবো, ভিটেমাটি গেছে যাক্, নিরিবিলি ঘুমোবার ত ছোটোখাটো ঠাঁই মিলেছে।

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয়। আমি না হয় তাঁদের কথা আরো একটু বেশী মেনে নিয়ে গোটাগুটিই “বয়্যা হুসিকেশ” করে বসে আছি। এতে অন্তায়টা কি করেছি বলুন?

যা ডামাড়োলের বাজার পড়েছে, নেংটের নেই বাটপাড়ের ভয়।

আমার সংসারে ঝামেলা কম।

স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছেলে। কাজেই ৱেশন কার্ডের বাইরে কালো বাজার থেকে চাল কিনতে হয় না। দশটা-পাঁচটা অফিস

ক'রে মনে করি আমিই বা কে আর রাণী এলিজাবেথের
কুমারই বা কে ।

গৃহিণীর মুখে হাসি-খুসি যেন উপচে পড়েছে । বললেন, দুটি
ঘর বটে কিন্তু ভারী সুন্দর । ভেতরের ঘর হবে শোবার আর
বাইরের ঘরে তোমার ছত্রিশ-জাতের বন্ধু আসুক, আমার বিন্দুমাত্র
আপত্তি নেই । কিন্তু একটি নোটিশ আগে থাকতেই দিয়ে রাখছি,
চা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে না-মঞ্জুর হবে । তবে যদি ঝোলা-গুড়ে
আপত্তি না থাকে, নেহাৎ ঝোলাবুলি করলে সকাল-সন্ধ্যা কয়েক
কাপ পেলেও পেতে পারো ।

করজোড়ে বললাম, তথাস্তু দেবি !

তারপর, মুদ্রিত নেত্রে জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন
করলাম, এখন আর কোন কিছুতেই আপত্তি নেই, রাত্তিরে একটু
ঘুমিয়ে বাঁচবো ।

গৃহিণী কথাটায় সায় দিলেন এবং ঘুমটাকে আরামদায়ক ও
মধুরতর করবার জন্তে বালিশের ওপর সত্ত্ব রজক-গৃহ-প্রত্যাগত
শ্বেতবকপাখা-সদৃশ তোয়ালে পেতে—দিশি মতে (থুড়ি মোগলাই
মতে) একটু আতর ছিটিয়ে দিলেন ।

এর পরেও যদি সুনিদ্রা না হয় তবে যেন অনিদ্রার 'ইনজেক্শন'
নি—তাতে বিষে বিষক্ষয় হবে ।

*

*

*

না, ঘুমের দোষ দিতে পারিনে ।

ঘুম এসেছিল এবং মায়ের কোলের মধুর দোলানির মতো
সেই আবেশ আমায় বিশ্বাসিতর অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ।

কিন্তু গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল কেন ! বালিশে ছারপোকা নেই, মনে নেই ময়লা । পাশে প্রেয়সী, আতরের গন্ধে গোটা ঘর ভূর্ ভূর্ করছে, তবু ঘুম ভাঙে কেন ?

ঘুমটা ভাঙবার পরও কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব । চুপ্ চাপ ভাবতে লাগলাম, তাল কাটলো কোথায় ?

শুন্তে পাই অতি আনন্দেও লোকে কাঁদে ! আমারও কি সেই দশা হল নাকি ?

আর না-ই বা হবে কেন ? কথায় বলে, কুকুরের পেটে ঘী সয় না !

অনেক দিন পরে আরামের বিছানা পেয়ে অশ্রুবিধায় অভ্যস্ত দেহ বোধ করি ধর্মঘট করবার মতলব আঁটছে !—না-না, তা ত' নয় !

সেলাগী আর ছ'মাসের ভাড়ার টাকা, সবটাই জলে গেল না ত' ?

ওই ত আবার কে যেন নাকি-কান্না শুরু করে দিলে ! গিন্নীকে ঠেলে জাগিয়ে দেবো কিনা ভাবছি এমন সময় নাকি কান্নার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে গুরু গন্তীর গলায় ধম্‌কানি শোনা গেল !

রাম বলো !

ঘাম দিয়ে সত্যি জ্বর ছাড়লো !

তা হলে আসল ভুত নয়—, মানুষ ভুত !

পাশের ফ্যাটে যেন অহি-নকুলের যুদ্ধ চলছে !

আর কিছু ঘোষণা করবার পূর্বেই গৃহিণী জেগে উঠলেন, তার পর সভয়ে বললেন, শুন্‌হ, একটা মাতাল বোধ করি তার বৌকে ধরে ঠাঙ্গাচ্ছে ।

দেখলাম, আমার চাইতে আমার গৃহিণী রোগানর্ণয়ে অধিকতর পটু। ডাক্তারী বিদ্যে জানা থাকলে বেশ ভালো রকম পশার জমত।

স্ত্রী-ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ গর্বিত হয়ে উঠলাম এবং পাশের ফ্ল্যাটের মাতাল স্বামীরত্নটিকে যে বেশ শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, দৃঢ় কণ্ঠে সেই অভিমত ব্যক্ত করলাম।

কিন্তু গৃহিণী সাবধান করে দিলেন যে, মাতালদের কোনো কাণ্ড-জ্ঞান নেই...ঝোঁকের মাথায় তারা নাকি যে কোনো লোকের গায়ে বমি করে দিতে পারে!

শুনে—মনে এমন ভাব জাগলো না যাতে দরজা খুলে পাশের ফ্ল্যাটের স্বামীরত্নটিকে শিক্ষা দেবার সদিচ্ছা বলবৎ থাকে!

আরো কিছুক্ষণ চুপ চাপ থম্ থমে আবহাওয়ায় কাটলো; তার পর নিষ্ক্রিয়তার উল্টো হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর আদপেই খেয়াল নেই।

পরদিন সকাল বেলায় মনে কোনো কোতূহলই জেগে রইল না। কেননা কেরানীদের সকাল বেলাটা রেসের ঘোড়ার মতোই তড়িৎ-গতিতে কাটে।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে বাজার পর্ব শেষ করতে হবে। তার পর ওরই ফাঁকে রয়েছে সংবাদ-পত্র পাঠের সঙ্গে ঈষদুষ্ট চা পান।

গৃহিণীর সঙ্গে গবেষণা করি সে অবসর কোথায়? কোনো রকমে নাকে-মুখে গুঁজে—বাঁ হাতে পান নিয়ে, ডান হাতে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে সার্কাসের কসরৎ করতে করতে কেরানীকুলে যে ভাবে

ডালহৌসি স্কোয়ারে অফিস করে, ভবিষ্যৎ কালে তা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় হয়ে রইল।

কিন্তু অফিস-অন্তে জীবনটা হয়ে আসে বেশ মন্থর। কালিদাসের কালের মতো আর কোন ত্বরা থাকে না। ট্রামে-বাসে যদি অত্যধিক ভীড় হয়...হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে না হয় চলেই এলাম। আমাদের সনাতন ফুটপাথ ত' আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

গৃহিণী যেন গৃহে একেবারে আমার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। বিয়ের অব্যবহিত পরেও আমার অপেক্ষায় এতটা ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখিনি।

শ্রীমতীর চোখে-মুখে আমেরিকা আবিষ্কারের উৎসাহ!

মুখ টিপে হেসে বলেন, ছুপুর বেলা সব কিছু জানা গেল।

—কী জানা গেল? আমি বিস্মিত হয়ে উঠি। আমার পুরাণো ধূতি খানকয়েক লুকিয়ে রেখেছিলাম। শ্রীমতী তাই আবিষ্কার করে বাসন-ওয়ালির কাছ থেকে আজ-বাজে বাসন কিনে বসেন নি ত?

—কিন্তু না; গেরস্তালীর পথে এতখানি পুলক সঞ্চারের কথা নয়।

অবাক হয়ে চির-পরিচিত গৃহিণীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে বইলাম।

শ্রীমতী তখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন—পাশের ফ্ল্যাটের বৌটি নাকি নিরিবিলা ছুপুরে তার সঙ্গে ভাব করে গেছে। টাকা-পয়সার অভাব নেই ওদের। ব্যাঙ্কে মোটা টাকা সঞ্চিত আছে।

কিন্তু স্বামীর ঘোড়া-রোগ আর মদের নেশা। নইলে মানুষ নাকি তিনি মন্দ নন।

মনে মনে বললাম মানুষ তিনি ভালো হোন, তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই, কিন্তু ছপূর রাত্তিরে পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের ঘুম ভাঙাবার রোগটি ত' ভালো নয়! বেশী বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে খবর দিতে হবে।

আমার নিরুৎসাহ মুখখানি নিরীক্ষণ করে গৃহিণী বোধ করি হতাশ হয়ে গেলেন। কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী তিনি নন। তাই বললেন, বৌটিও ভারী হাসিখুশী—মিষ্টকে।

এইবার আমি মুখ খুললাম।

—তবে ছপূর রাত্তিরে পেত্নীর মত নাকি-কান্না শুরু করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কেন?

শ্রীমতী হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন, তারও একটা কারণ আছে। ওর স্বামীটি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়লেই ক্রমাগত ওকেও মদ খেতে জিদ করতে থাকে! তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া...শেষকালে ধরে একেবারে মার! বৌটি বললে, ওর স্বামী নাকি ওকে সত্যি ভালোবাসে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, হ্যাঁ, ভালোবাসার নমুনা কাল রাত্রে যা দেখিয়েছেন...একেবারে পেটের পিলে চম্কে উঠেছিল।

এইবার গৃহিণী চটে উঠলেন বলে মনে হল।

বন্ধিম দ্রু-নির্দেশে বললেন, তোমরা সব জিনিসটারই উল্টো মানে করে বসে থাকো! ওর বৌ বলছে খুব ভালোবাসে...আর তোমার তাতে অবিশ্বাস! তুমি ত আর ভদ্রলোককে নিয়ে ঘর করো না।

অকাট্য যুক্তি !

এর ওপর আর কোনো প্রতিবাদ করা চলে না !

পরবর্তী ছুটো রাত বিনা উপদ্রবে—একটানা ঘুমে বেশ কাটল ।

সেদিন অফিসে বড়বাবুর দাঁত-মুখ থিঁচুনি খেয়ে মন-মেজাজ ভারী বিগড়ে ছিল ।

তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়লাম ।

গভীর রাত্রে...আবার সেই বড়বাবুর গৌফওয়ালা বদনে পান ভর্তী বিকৃত মুখ...আর তারই সঙ্গে দাঁতমুখ থিঁচুনি...

চীৎকার ক্রমে বেড়ে উঠল ।

কিন্তু না, এ ত বড়বাবুর আফালন নয়...পাশের ফ্ল্যাট থেকেই হুমকিটা আসছে বলেই মনে হল !

বড়বাবুর হুমকিটা পাশের ফ্ল্যাটের মাতালের চীৎকারের সাথে দিব্যি মিশে গেল ।

সিনেমার লোক হলে বলত, এরই নাম হচ্ছে আর্ট...বড়বাবুর দাঁত-মুখ থিঁচুনি ‘ডিজলভ্’ হয়ে পাশের বাড়ীর চীৎকারে রূপান্তরিত হল ।

হঠাৎ আবার বোটের নাকি-কান্না শুরু হল । নাঃ ! এদের পতি-পত্নী প্রেমের ঠালায় আমি গরীব কেরানী প্রাণে মারা যাই ।

গিন্নীকে ঠালা ‘দয়ে জাগিয়ে বন্ডাম, কি রকম ভালবাসার প্রতিযোগিতা চলছে শুনতে পাচ্ছ ত ?

গিন্নী জেগে উঠেছেন বুঝতে পারলাম, কিন্তু কোনোরকম সাড়া দিলেন না ।

যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো শক্ত । তাই সে চেষ্টা

না করে দাম্পত্য-প্রেমের গতি শুয়ে শুয়ে অমুখাবন করতে লাগলাম ।

হঠাৎ বোটি আচমকা এমন একটা চীৎকার করে উঠল যে মনে হল...তার মাথায় বুঝি ডাঙা মারা হয়েছে ।

এইবার আমার শ্রীমতী নীরবতা ভঙ্গ করলেন, বল্লেন, বলি চুপ করে শুয়েই থাকবে ? একটু ওঠো না—বোটাকে যে একেবারে মেরে ফেলে ?

অফিসে বড়বাবু, আর বাড়ীতে রয়েছে পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক । যদিও তারে গোখে দেখিনি...শুধু বাঁশী শুনেছি !

গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, প্রয়োজন থাকে পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি গিয়ে মোলাকাৎ করতে পারো, আমার অতখানি উঃসাহ নেই ।

শ্রীমতী বল্লেন, আমি ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

অনাসক্ত ভাবে উত্তর দিলাম, মাথা যার সত্যি খারাপ হয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—আর তা ছাড়া তুমিই ত বলেছ, মাতালরা যে কোনো মুহূর্তে গায়ে বমি করে দিতে পারে । সে বমি ত' শেষ পর্যন্ত তোমাকেই মুক্ত করতে হবে ।

শ্রীমতীকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝলাম ওষুধ ঠিক ধরেছে ।

নাঃ, আর ত' পারা যায় না ।

ভদ্রলোকের হুঙ্কার যেন ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো । জীবনে এক-

এক সময় এমন বিরক্তি আসে যখন অবলীলাক্রমে একটা মানুষকে খুন করে ফেলা চলে।

কিন্তু আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ। মনে যখন ইচ্ছে জাগে বড়বাবুর গৌফ ধরে এক টান মারি, তখন মাথা চুলকে বলতে হয়, আক্ষেপ, এ রকমটি আর কখনো হবে না।

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মানুষের মনে খুন চেপে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; মনস্তাত্ত্বিকেরা হয় ত সেই কথাই বলবেন।

ক্রমাগত চীৎকার শুনে শুনে আমিও ফেপে গেলাম। শ্রীমতীকে ডেকে বললাম, দেখ, ঘুমের দফা যখন গয়া, তখন এদেরও শাস্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না! আমাদের সেই পুরোণো ঝরে-ঝরে চোঙ-ওয়ালা গ্রামোফোনটা আছে, সেইটেই চাবি লাগিয়ে একটা রেকর্ড চাপিয়ে দাও ত দেখি, কপোত-কপোতী কেমন করে ঝগড়া করে!

গৃহিণী রেগে উঠে বলেন, ছপূর রাত্তিরে গ্রামোফোন? তুমিও কি আজকাল মদ ধরেছে নাকি?

আমি বললাম, ধরিনি, তবে ধরবো ব'লে স্থির করেছি। কেননা, মদই হচ্ছে ভালোবাসার ব্যারোমিটার!

মুখ ঝামটা দিয়ে গৃহিণী পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

যাহোক একটা কিছু কাণ্ড আমায় করতেই হবে। সত্যি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

পাকিস্তান থেকে চলে আসবার মুখে ঠাকুরদার আমলের চোঙ

দেয়া এই 'কলের গান'টা নিয়ে এসেছিলাম। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তার যে এমন প্রয়োজন হবে সে কথা ইতিপূর্বে ভাবতে পারি নি।

পুরোণো জিনিষ-পত্র হাতড়ে সেটা বের করে নিয়ে এসে ক'ষে চাবি লাগিয়ে দিলাম।

ওদিকে চাঁৎকারের মাত্রা উদার—মুদার! ছেড়ে একেবারে তারায়

উঠে গেছে!

রেকর্ডও কি ছাই
আছে!

সেই পুরোণো
আমলের গোটা কয়েক
বহু বাবু ছত ভাঙ্গা
রেকর্ড।

অনশেষে বেজে উঠল
গ্রামোফোন রেকর্ড
তার বিকৃত স্বর নিয়ে—

“আমি তো মা র
জন্মে কাঁদি—

তোমার প্রাণ কি
কাঁদে নারে?”

ভাবলাম—এইবার ঝগড়াটে সুখী-দম্পতি গলা আরো চড়াবে।
ভদ্রলোকের কর্কশ কণ্ঠ ছাড়িয়ে যাবার দাবী রাখে এমন গানের
নমুনা দেখাতে পেরে আমিও মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম।



সত্যি ! কি অবাক্ কাণ্ড !

গান শুনে ভদ্রলোক একেবারে চুপ ।

ব্যাপারটা কি, ঠিক বোঝা গেল না ।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধ দরজায় করাঘাত শোনা গেল ।

আমরা কর্তা-গিন্নী পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম ।

ভদ্রলোক বাড়ী চড়াও করে মারামারি করতে এলো নাকি ?

আবার শব্দ ।

তাবই সাথে আবার চাপা মেয়েলী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ও দিদি, শীগ্‌গির দরজাটা একবার খোলো না ।

শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকালাম । গৃহিণী বল্লেন, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে, নইলে এত রাত্তিরে এসে কেউ দরজা ধাক্কাই ?

নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলাম, যাওনা, দরজা খুলে তোমার নতুন পাওয়া বান্ধবীর কথা শোনো—

গৃহিণী দুই চোখে অগ্নি বর্ষণ কবে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলেন ।

অনেকক্ষণ ধরে ফিস্-ফিস্ আলোচনা চললো আমার বৈঠকখানা ঘরে ।

আধঘণ্টা পরে শ্রীমতী ফিরে আসতে যে সন্দেশ পাওয়া গেল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব ।

পাশের বাড়ীর কর্তা নাকি ওই রাসভনিন্দিত কলের গান শুনে চুপ মেরে গেছেন । বোটের বিবরণে প্রকাশ, সাপের মাথায় যেন ধূলোপড়া দেয়া হয়েছে । এতদিনে ছুরারোগ্য ব্যাধির টোটকা মিলেছে ! কাজেই ওই রেকর্ডটি তার চাই ।

*

*

*

*

রেকর্ডটিকে হাতছাড়া করতে হয়েছে। তবে আমরা তার বদলে
রাত্রির নিরুপদ্ৰব-নিদ্রা ফিরে পেয়েছি। মাঝে মাঝে যখন গভীর
রাত্রে ভাঙ্গা কণ্ঠের গান শুনি—

“আমি তোমার জন্মে কাঁদি
তোমার প্রাণ কি কাঁদে নারে—”

—তখুনি স্বামী-স্ত্রী বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, সাপের
মাথায় ধূলোপড়া দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে !



সকালে ঘুম ভাঙতেই রামগোবিন্দের মনে হল—আজ তার নবজীবন। সারা জীবন তপস্যার পব আজ সে সাফল্য লাভ করেছে।

পাঠক-পাঠিকা হত মনে করেছেন—শ্রীমান রামগোবিন্দ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছে।

কিন্তু তা নয়। খবর আরও চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। সাত বছর ষ্টুডিও অঞ্চলে ঘোরাঘুরির পর আজ সে বাণ্যাকি চিত্র প্রতিষ্ঠানের নির্মিয়মান চিত্র “আলুথালুকেশা” ছবিতে সর্বপ্রথম একটা সুযোগ পেয়েছে।

পরিচালকমশাই বহুক্ষণ ধরে তার চেহারা নিরীক্ষণ করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তার চোখ ও নাক যেমন অভিনব—তাতে গুণ্ডার পাট সে ‘রিয়ালিষ্টিক’ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

যদিও এই বিশিষ্ট ভূমিকায় কোন ‘বচন’ বলবার অধিকার সে পায় নি—কিন্তু পরিচালকমশাই তাকে গোপনে ডেকে বলে দিয়েছেন, ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশের বহু সুযোগ আছে এই অংশে। রূপসজ্জাই নাকি উল্লেখযোগ্য হবে গুণ্ডাটির। এমন পাট করতে হবে যে, চিত্রটি যখন পর্দায় প্রতিফলিত হবে, ছেলে মেয়েরা ভয়ে আঁৎকে উঠবে, তরুণীরা শঙ্কিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দর্শককে জড়িয়ে ধরবে, স্বামী স্ত্রীর অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করবে, শিক্ষক ছাত্রকে পীড়ন করা ভুলে যাবে, ছাত্রের মনে নকল কার্যে বাধা-দানকারী শিক্ষককে শিক্ষা-দান স্পৃহা জেগে উঠবে এবং বৃদ্ধের গঙ্গাযাত্রার বাসনা জাগরিত হবে।

গত রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাই রামগোবিন্দ বহুক্ষণ ধরে আয়নার সামনে বহুবিধ মুখ-বিকৃতি করে গুণ্ডার ভূমিকাটি আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে।

আজ দুপুর বেলা সেই দৃশ্যেরই স্মৃতিং হবে। ঝিকে বকে, চাকরকে ছম্কে দিয়ে, ঠাকুরকে তাগিদ দিয়ে সে সকাল থেকেই ‘সিন্-ক্রিয়েট’ করতে শুরু করে দিলে। বন্ধু-বান্ধবদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিলে—“আলুথালুকেশা” যখন পর্দায় প্রতিফলিত হবে—তখন সে তাদের “পাশ” দিয়ে আপ্যায়িত করবে, কিন্তু তারা ‘মেক্-আপে’র আড়ালে রামগোবিন্দকে হয়ত চিন্তেই

পারবে না ! পরিচালক মশাই বলে দিয়েছেন, তাকে সাজাবার জন্তে বিশেষ রূপসজ্জাকারী নিয়োগ করা হয়েছে ।

পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা গৃহে রওনা হবার আগে যেমন তাড়াহুড়ো করে, রামগোবিন্দ তার চাইতেও তৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরিয়ে এলো । সবাই ডালহোসী স্কয়ারের যাত্রী । কিন্তু কেউ জানে না—ভাবীকালের বিশিষ্ট চিত্রতারকা রামগোবিন্দ পতিতুণ্ডী তাদের পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে । কিন্তু পর পর দু'খানা ছবিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে সে যখন নিজের গাড়ীতে চড়ে, ধূলো উড়িয়ে টালিগঞ্জের দিকে রওনা হবে—তখন তাকে দেখবার জন্তে, আর চকিতে তার ছবি তুলে নেবার বাসনায়, বাড়ীর সামনে ভীড় জমে থাকবে ; এই সব হতভাগ্য কেরানীরা তখন রামগোবিন্দ পতিতুণ্ডির মোটরের ধূলো খেয়ে ট্রামেবাসে ওঠবার জন্তে ছুটোছুটি করবে এবং গলদঘর্ম হয়ে একটা সিট জোগাড় করে চলতি সিনেমা পত্রিকায় “নবোদিত সিনেমা তাড়কার (!) একটি দিন” পাঠ করতে করতে অফিসে হাজির হয়ে দেৱী হওয়ার জগে বড়বাবুর ভৎসনা গলাধঃকরণ করবে নীরবে ।

সত্যি ওদের দুর্দশার কথা ভেবে দুঃখ হতে লাগলো রামগোবিন্দের । হারুণ-অল-রসিদ যেমন লুকিয়ে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বেড়াত—আজ রামগোবিন্দেরও ঠিক সেই রকম ছদ্মবেশ ধারণ । এ ত' তার আসল রূপ নয় ! আসল রূপ ফুটে উঠবে—সেই আগামী দিনের “নবোদিত সিনেমা তাড়কার (!) একটি দিন” আলেখ্যে ।

টালিগঞ্জে পথে তাকে ছবার বাস থেকে নামতে হল । একবার ঠনঠনে কালীবাড়ীতে আর একবার কালীঘাটের পীঠস্থানে । সেখানে

সে তার গোপন কামনা শতবার নাক-কান মলা খেয়ে আর মাথা খুঁড়ে জানিয়ে এলো। মা পাষাণী বলে সেই গোপন-কথা আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে না। এই তার একমাত্র সাঙ্খ্যনা।

ষ্টুডিওতে পৌঁছে দেখল, সেটিংস ডিপার্টমেন্ট দৃশ্য পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপর। তখনো আর কেউ এসে পৌঁছয় নি।

রামগোবিন্দ আপন মনে পা দোলাতে লাগলো আর দেশের লোকের সময়ানুবর্তিতা নেই বলে ভারতবাসী জগৎ-সভায় ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে এই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

একে একে সবাই আসতে লাগলেন, এলেন প্রোডাকসন ম্যানেজার, সহকারী পরিচালক দল, খাবারের লোকেরা, মেকাপ-ম্যান প্রভৃতি। রামগোবিন্দ মেকাপম্যানকে নিয়ে নিজের ভূমিকা ও বাসনা-কামনার কথা সালস্কারে জানালো। সে এমনি বেরসিক যে পরিচালকের অনুমতি না পেলে কিছু করতেই রাজি হল না। রামগোবিন্দ তাকে একথাও জানিয়ে দিতে ভুললো না যে, সেই হবে ভাবীকালের ‘লনচ্যানী’।

মেকাপম্যান অবজ্ঞার হাসি হেসে জানতে চাইলে, লনচ্যানী দেবযানীর কেউ হয় কিনা!

পর্বত-প্রমাণ মূর্ত্যামীর সম্মুখীন হয়ে রাগ ও দুঃখে রামগোবিন্দ চুপ করে বসে রইল। ভাবলে, বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে লাভ কি?

অবশেষে এলেন পরিচালক ও ছবির নায়িকা।

আজ কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্য তোলা হবে—তার সবগুলিই

নায়িকাকে নিয়ে। শেষ দৃশ্যে গুণ্ডা নায়িকাকে তাড়া করলে সে
প্রাণের ভয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এই হচ্ছে চিত্র-নাট্যের
বিষয়-বস্তু।

পরিচালক বল্লেন, রামগোবিন্দ, তোমার সিনটি সকলের শেষে
তোলা হবে।

সে জবাব দিলে, তা হোক স্মার। আপনি মেকাপ-ম্যানকে
বলে দিন, আমার সাজতে ত' অনেক সময় লাগবে। টাইপ পার্ট
...সম্পূর্ণ অভিনব টাইপ যেন হয়—আপনি এই নির্দেশ দিয়ে
দিন।

মুচকি হেসে পরিচালক মেকাপ-ম্যানকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে
বলে দিলেন।

নায়িকার জ্ঞে ত' আলাদা ঘর—আলাদা মেক-আপ! স্মুতরাং
রামগোবিন্দ মনের আশ মিটিয়ে সাজতে বসল অস্থ ঘরে। মেকাপ-
ম্যানের হাতে কাজ চলে, আর রামগোবিন্দের নির্দেশ চলে মুখে।
ক্রমে শেষ অংশটা যেন কপালে গিয়ে ওঠে...চোখের মণি ঠিকরে
বেরিয়ে আসবে ত? একটা নকল দাঁত এমনভাবে তৈরি করে দিতে
হবে যেটা দেখলেই দর্শকরা বুঝতে পারবে—ভূমিকাটি কি!

মেকাপ-ম্যানের হাতেও সেদিন বিশেষ কাজ নেই...বহুক্ষণ ধরে
...সে আবদার রক্ষা করে এই নবতম চিত্র তাড়কার! কোনো নতুন
পড়ুয়া পাঠশালায় ভর্তী হলে পণ্ডিত মশাই যেমন স্নেহ দৃষ্টিতে
তাকায়—অনেকটা সেই অনুকম্পা নিয়ে সব আবদার রক্ষা করে
রূপসজ্জাকর।

একটি দুর্দান্ত গুণ্ডায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে রামগোবিন্দ। শেষ

তুলির টান দিয়ে মেকাপ-ম্যান বলে, দেখুন ত' নিজেকে চিন্তে
পারেন কিনা ?



আয়নার দিকে
তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে
ওঠে রামগোবিন্দ ।
বলে, হ্যাঁ, আপনার
হাতের মূলি যা না
আছে। এমনটাইপের
সৃষ্টি করবো যে,
সিনেমা-জগৎ চিরকাল
মনে করে রাখবে ।

সেদিন স্টুডিং-এর
আগেই এই নবতম
তাড়কা একটা খণ্ড-
প্রলয়ের সৃষ্টি করে ।

তার রূপসজ্জা দেখে নায়িকা হুম্‌ড়ি খেতে খেতে নিজেকে সামলে
নেয়, দারোয়ান দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে, খাবারওলা মনে মনে খাবি
খেতে থাকে ! এমন কি পরিচালক পর্যন্ত প্রথমটা অবাক হয়ে
তাকিয়ে থাকেন ! রামগোবিন্দ তাঁর পারের ধূলো নিয়ে বলে,
আপনি আশীর্বাদ করুন—আমি যেন “লন্‌চ্যানি অফ্‌ বেঙ্গল”
হ’তে পারি !

অত্যাণ্ড ফ্লোর থেকে খবর পেয়ে লোক ছুটে আসে । গুণ্ডাকে
দেখতে ভীড় জমে যায় !

নায়িকা বলে, এই গুণ্ডা যদি সত্যি আমায় তাড়া করে তবে আগে থেকেই আমি হার্টফেল করে বসে থাকবো।

সেদিন গোটা ষ্টুডিওর সবাইকার মতামত গ্রহণ করে রামগোবিন্দ। সেটিংস্ ডিপার্টমেন্টের মিস্ত্রি থেকে শুরু করে চা পরিবেশনের বেয়ারা পর্যন্ত তার প্রশ্নে হকচকিয়ে ওঠে।

এ ঘর থেকে ও ঘরে—এ ফ্লোর থেকে ও ফ্লোরে অব্যাহত অভিযান চলে তার।

চা দিতে এসে বলে, না—না—আজ আর চা নয়, মেকাপ উঠে যাবে! দুপুর বেলা যখন খাবার আসে—সে আঁতকে উঠে বলে, ওরে ধাবা! এখন খাবার খেতে গেলে আমার নকল দাঁত পড়ে যাবে! সব হবে স্টিং-এর পর।

অভিনয় করার আগেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে রামগোবিন্দ। নকল দাঁতের গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠে ষ্টুডিও অঞ্চল। গুণ্ডা যে সত্যি একটা রেকর্ড করবে—সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না কারো।

ইঠাং একসময় পরিচালক মশাই ওর দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠেন। একি! ঘামে তোমার সব মেকাপ যে উঠে যাচ্ছে! এই দারুণ রোদ্দুবে সারা ষ্টুডিও বুঝি লাটিমের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে? এইবার গুণ্ডার সিন্ নেয়া হবে। যাও—যাও আবার নতুন করে মেকাপ নিয়ে এসো—

রামগোবিন্দের মাথায় যেন আচমকা আকাশ ভেঙে পড়ে! তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রূপ-সজ্জাকরের ঘরে। সে বেচারী ফ্যান খুলে দিয়ে মহানন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে! অকালে কুন্তকর্ণের নিজা ভঙ্গ হলো যা হয়, তাই হল। প্রথমটা সে ভারী চটে গেল,—

তারপর মুখখানাকে গোমরা করে আবার রামগোবিন্দের মুখ নিয়ে পড়ল।

এদিকে ফ্লোরে আবার অঘটন ঘটল।

বিরট গাড়ী করে প্রযোজকমশাই এসে হাজির।

কোথায় তিনি টি-পার্টির আয়োজন করেছেন—নায়িকাকে তাঁর সঙ্গে তক্ষুনি যেতে হবে।

পরিচালক মাথায় হাত দিয়ে বলেন, পনেরো মিনিট অপেক্ষা করুন স্তার—এইটি নায়িকার মৃত্যু-দৃশ্য। গুণ্ডা সাজতে গেছে—এলো বলে।

প্রযোজক চটে-মটে উঠে ফতোয়া জারি করলেন, আমার' আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার যো নেই। নায়িকাকে মারতে চান—ভালো কথা, কিন্তু আগে মেরে রাখেন নি কেন? আমি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলাম আপনাকে! গাড়ী চাপা দিয়ে মারুন, হেঁচট খাইয়ে মারুন, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাক্—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরুক...মোট কথা এসব গুণ্ডোগোলে ব্যাপার আগেই করা উচিত ছিল। এখন আর আমি এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবো না। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সব অপেক্ষা করছেন।

নিরুপায় পরিচালক চারদিকে তাকান।

হঠাৎ বলে ওঠেন, ইউরেকা! হয়েছে! নিজের চুলে ফাঁস লাগিয়ে মরবে নায়িকা! কুইক্!

নায়িকাও টি-পার্টিতে যাবার জগে তৈরী হয়েই আছেন! কাজেই চুলে ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে তার এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না।

ক্যামেরাম্যান সবে তার হাতল ছেড়েছেন...এমন সময় হস্ত-দস্ত হয়ে ফ্লোরে এসে ঢুকলো—নতুন মেকাপ করা রামগোবিন্দ ! কিন্তু তখন গুণ্ডার প্রয়োজন ছবি থেকে একেবারে ফুরিয়ে গেছে !

তাকে ধাক্কা মেরে এক পাশে হটিয়ে দিয়ে প্রযোজক নায়িকাকে নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলেন ।

রামগোবিন্দ শুধোলে, তাহলে আমার অবস্থা ?

পরিচালক বল্লেন, নেকষ্ট্ পিক্চারে তোমায় আমি সুযোগ দেবো, —ভেবোনা তুমি ! সে মরিয়া হয়ে বল্লেন, তাড়া করবো নাকি লোকটাকে ? গুণ্ডার অসাধ্য কিছুই নেই—!

পরিচালক তার হাত ধরে বল্লেন, তার চাইতে হোটেল থেকে ভালো ডেভিল এসেছে—তাই খাও—।

রামগোবিন্দ দুই চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করে বেরিয়ে গেল । তার চোখের ভাষা হচ্ছে এই যে, গুণ্ডার পার্ট সিনেমায় করতে পারল না বটে—রাস্তায় জল-জ্যান্ত সেই ভূমিকাতেই অভিনয় করবে সে !

—আর সে পার্ট হবে সত্যি রিয়ালিষ্টিক্ !

মেকাপ-ম্যান ভয়ে ভয়ে বল্লেন, চিত্রতারকা ত' নয়—আসল তাড়কা !



ডুপ ওর আগে

[নাটমঞ্চে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন-রজনী। নতুন নাট্যকার, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী জয়মালা নাট্যিকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন বলে প্রেক্ষা গৃহে তিল ধারণের ঠাই নেই। যবনিকা উত্তোলিত হবার কয়েক মিনিট আগে আমাদের নাটকের স্রষ্টা এবং ডুপ ওর সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকেব শেষ। একে আপনারা পাঁচ মিনিটের নাটকও বলতে পারেন]

[স্থান—থিয়েটারের ম্যানেজারের কামরা]

—ম্যানেজার—

ওরে, কে আছি...খবর নে, জয়মালার সাজা শেষ হয়েছে কি না! না হয় জোরে আর একটা কন্সার্ট দিয়ে থার্ড বেল বাজিয়ে দিতে বল!

(ছুটে মেক্-আপ-ম্যানের প্রবেশ)

সর্বনাশ হয়ে গেছে ম্যানেজারবাবু !

—ম্যানেজার—

কি পাগলের মতো যা-তা কথা বলছি! আজ নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধন-রজনী, আর বলছি কিনা সর্বনাশ হয়ে গেছে !

—মেক্-আপ-ম্যান—

আজ্ঞে, প্রথম দৃশ্যেই নায়িকার হীরের ব্রোচ্ পরার উল্লেখ আছে। নায়িকা, জান্‌লা গলিয়ে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ সেটা নায়কের হাতে ছুঁড়ে দেবে।

—ম্যানেজার—

বেশ ত’ “বিজ্‌নেস্ ম্যানেজারকে” ত একটা নকল হীরের ব্রোচ আনতে বলে দিয়েছি।

—মেক্-আপ-ম্যান—

তা হলে আর গোল কিসের স্মার ! বিজ্‌নেস্ ম্যানেজারের কোন দোষ নেই ! তিনি ঠিক “পিস্‌গুড্‌স্” জোগাড় করে রেখেছেন।

—ম্যানেজার—

তবে আটকাচ্ছে কোথায় শুনি ?

—মেক্-আপ-ম্যান—

আজ্ঞে, জয়মালা নকল হীরের ব্রোচ্ পরবেন না...গৌ ধরেছেন ! ওদিকে কনসার্ট ওয়ালাদের বাজাতে বাজাতে হাতে খিল ধরে গেল ! ড্রপ কিছুতেই উঠতে পারছেন না স্মার ! এখন যা হয় একটা বিহিত করুন !

—ম্যানেজার—

তাইত ! আসল হীরের ব্রোচ ! আমায় বিক্রী করলেও জোগাড় হবেনা ! আজ বাদে কাল আর্টিষ্টদের মাইনে দিতে হবে । এই নতুন নাটকে কিছু পাওয়া যাবে সেই ভরসা !

—মেক্-আপ-ম্যান—

তা'হলে কি হবে স্মার ? মেক্-আপ বন্ধ রাখবো ?

—ম্যানেজার—

(চটে উঠে) মেক্-আপ ! এখন চুন আর কালি নিয়ে এসে আমার ছ'গালে মাখিয়ে দাও ! যাও...যাও...বলছি...

[সভয়ে মেক্-আপ-ম্যানের প্রস্থান আব শাল্মলী তরফদারের প্রবেশ]

—শাল্মলী—

আজ যে খুব বিক্রী করেছ ম্যানেজার ! ছুটো ফাউল কাটলেটের অর্ডার দাও দেখি !—

—ম্যানেজার—

আমায় চটিওনা বিশাল-শাল্মলী তরু ! মন-মেজাজ ভালো নেই !

—শাল্মলী—

সেকি হে ম্যানেজার ! বাইরে “হাউসফুল” টাঙানো...তবু তোমার মুখে হাসি নেই ! (সীতার স্বরে) বিরস বদনে, আনমনে বসিয়া একাকী ! কি হয়েছে জীবন-বল্লভ ?

—মুখ বাড়িয়ে মেক্-আপ-ম্যান—

আজ্ঞে, মহা বিপদ ! জয়মালা নকল হীরের ব্রোচ পর্তে চাইছেন—ড্রপও উঠছেন !

—শাল্লালী—

(মহা উৎসাহে) সে কথা আগে বলতে হয় ! আমি রয়েছি কিসের জন্ত ! ব্যাকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমি, সে কথা তোমরা ভুলে বসে থাকো...! ভয় নেই ! আমার সঙ্গে গাড়ী রয়েছে । (যেতে যেতে ফিরে এসে) ভাই, ষ্টেজের ওপর কথাটা “অ্যানাউন্স” করে দিও । আমি নিজে হাতে জয়মালাকে ব্রোচ পরিয়ে দেবো ।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

—ম্যানেজার—

(আপন মনে) এঃ ! দাতা বলীরাজ এলেন আর কি ! যখন বল্লাম, কিছু টাকা ফাইনাল করো. ‘ষ্টেজ’টাকে ভালো করি...জবাব দিলে, আমার টাকা কোথায় ! এখন ছুটলেন হীরের ব্রোচ কিনতে ! হাঙ্গাম !

—মেক্-আপ-ম্যান—

যাক্ ! বিপদ ত কেটে গেল ! আপনি আর ওঁর সঙ্গে চটাচটি করবেন না যেন স্মার !

—ম্যানেজার—

উনি আবার এলেন আমায় উপদেশ দিতে । যাও, জয়মালাকে গিয়ে বলো যে, হীরের ব্রোচই আসছে ! কি আহাম্মুকীই করেছিলাম থিয়েটার খুলে ! এর চাইতে কয়েক বিঘে জমি নিয়ে গাই-বলদ দিয়ে চাষ-আবাদ করলে আখেরে কাজ দিত । চাই কি সরকারী সাহায্যও পাওয়া যেত !

[মেক্-আপ-ম্যানের প্রস্থান, কিছুক্ষণ বাদে হলধর হালদারের প্রবেশ]

—হলধর—

এই নিন্ স্মার, আপনার বাবরী চুল, আর এই রইল আপনার
নায়কের পোষাক। আমি চল্লাম !

—ম্যানেজার—

(ব্যস্ত হয়ে) কেন, কেন, তোমার আবার কি হ'ল হলধর ?

—হলধর—

আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি স্মার ?

—ম্যানেজার—

(কাষ্ট-হাসি হেসে) —না—না ! দিব্যি কার্তিকের মতো চেহারা
তোমার, তুমি বানের জলে ভেসে আসবে কেন ?

—হলধর—

কিন্তু কার্তিক-চেহারায় ত' কুলোচ্ছে না স্মার। আর জন্মে
যেন আর কিছু হয়ে জন্মাই...।

—ম্যানেজার—

আহা ! চট্ছ কেন ? কি হ'ল তাই বলনা !

—হলধর—

প্রথম কথা—পোষ্টারে নায়িকার চাইতে আমার নামের টাইপ
ছোট কেন ? নায়ক বড়ো—না নায়িকা বড় ? এটা বাড়লা
দেশ ! এখনো আমেরিকা হয়ে ওঠেনি ! তা' ছাড়া আপনি নাকি
জয়মালাকে হীরের ব্রোচ দিচ্ছেন ? তবে আমিই বা হীরের আংটি
পাবোনা কেন শুনি ?

—ম্যানেজার—

সে সব বিবেচনা পরে করা যাবে। আর নাম? আগে উদ্বোধন-রজনী উৎসবে যাক্...তারপর তোমার নামাবলী দিয়ে আমি কলকাতার রাস্তার দেয়ালগুলি ঢেকে ফেলে দেবো।

[ছুটতে ছুটতে শাল্মলীর প্রবেশ]

—শাল্মলী—

এই যে ভাই ম্যানেজার, দেখো, হীরের ব্রোচটা জয়মালার পছন্দ হবে কিনা! দেখে নিও, খেলো জিনিষ আমি কাউকে দিই না!

—হলধর—

ও! হীরের ব্রোচটা আপনিই জয়মালাকে দিচ্ছেন! তা' হলে অবশ্য...

—শাল্মলী—

হেঁ—হেঁ! আপনি হচ্ছেন কলার সাধক। বুঝতেই ত' পাচ্ছেন সব। ষ্টেজে দাঁড়িয়ে জয়মালা যে সব প্রেমের কথা শোনায় আপনাকে, সবই কিন্তু বলে আমাকে উদ্দেশ্য করে। আমি “রয়েল-বক্সে” বসে থাকি...দেখেন নি লক্ষ্য করে, মাঝে মাঝে আমার দিকে কেমন ভাবে তাকায়?

—হলধর—

(ম্যানেজারকে) তবে আর আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। কিন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে স্থার। নইলে আমি—

—ম্যানেজার—

ঠিক কথা বলেছ হলধর। আজ থেকেই তোমার একশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল। যাও, মনের আনন্দে কাজ করো গে!

—হলধর—

(উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে) মনের আনন্দ আসবে কোথেকে স্মার ! যখন বুঝি নায়িকার ওই সব জোরালো প্রেমের কথাগুলি একেবারে সাবানের ফ্যানার মতোই অস্তঃসারশূন্য... শুধু হাওয়াতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন কি আর প্রাণে আনন্দ আসে? যাক একশ টাকা মাইনে বৃদ্ধি ! পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনাই লাভ !



[নকল চুল আর পোষাক
তুলে নিয়ে প্রস্থান]

। নাট্যকার এতক্ষণ চুপচাপ
ঘরের এক কোণে বসে-
ছিলেন—এইবার তিনি
একটু এগিয়ে এসে
ম্যানেজারকে বলেন ।

—নাট্যকার—

সবাইকারই সব সুবিধে
করে দিলেন স্মার !
আমার দিকে এক-
বার ফিরে তাকাবেন
না ?

—ম্যানেজার—

(ভাঙ্কিল্যের স্বরে)

আপনি আবার ড্রপ ওঠবার মুখে ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করে দিলেন ?

—নাট্যকার—

আজ্ঞে, মানে আমারই ত' নাটক—

—ম্যানেজার—

আপনার নাটক তাতে হয়েছে কি ?

—নাট্যকার—

এই বল্‌ছিলাম কি—[আম্তা আম্তা করে] উদ্বোধন রজনীতে
নায়িকা পেলো হীরের ব্রোচ, নায়কের হল মাইনে বুদ্ধি, আর
নাট্যকার নগদ কিছু পাবে না ?

—ম্যানেজার—

আপনি দেখি আমায় অবাক করলেন ! কাগজে কাগজে
আপনার নাম ছাপা হয়েছে, পোষ্টারে বড় বড় টাইপে আপনার
নাম লাল কালীতে ঝক্ ঝক্ করছে……এত কাণ্ডতেও আপনার
মন উঠল না ?

—নাট্যকার—

[কুণ্ঠিত হয়ে] এই মানে বল্‌ছিলাম কি ছেলেটা আজ এক মাস
থেকে টায়ফয়েডে ভুগছে। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করতে
পারছি নে ! ভেবে রেখেছি—উদ্বোধন রজনীতে যে টাকা পাবো
তাই দিয়ে ইন্‌জেক্‌শন কিনে নিয়ে যাবো। ডাক্তার আমার
বন্ধু—সে বসে রয়েছে !

—ম্যানেজার—

বসে থাকলেই হল ? আপনার কি ধারণা যে, আমি এখানে
দান-ছত্র খুলে বসেছি ?

—নাট্যকার—

কিন্তু টাকা ত' আমার পাওনা হয়েছে—ম্যানেজারবাবু !
আমার নাটকটা যখন আপনারা অভিনয় করছেন !

—ম্যানেজার—

আঁ্যা ! আপনি বলছেন কি মশাই ? আপনার নাটক ?
আপনি যে মশাষ্ট রাতকে দিন করতে পারেন !

—নাট্যকার—

আপনার কথা ত' আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ম্যানেজারবাবু !

—ম্যানেজার—

বুঝবেন কি করে বলুন ? মলাটখানি ছাড়া আপনার নাটকের
আর কি আছে শুনি ?

—নাট্যকার—

আঁ্যা ! শুধু মলাট ?

—ম্যানেজার—

হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুধু মলাট ! নামটা যে দিয়েছি এট আপনার
ভাগ্যি। যান, নীচে গিয়ে অভিনয় দেখুন গে ! ওরে হরে,
বাবুকে “স্পেশাল সিটে” বসিয়ে ঘণ্টা মেরে ড্রপ তুলে দিতে বল।

[যবনিকা]

—ইতি—

—স্বপন বুড়োর লেখা বই—

সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে ২৥
[ভ্রমণ কাহিনী]

গল্প-সঞ্চয়ণ ৩.
[বিভিন্ন রকমের শ্রেষ্ঠ গল্পের সংগ্রহ]

প্রাপ্তিস্থান :
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২